পৃথিবীর ইতিহাস
(আধুনিক যুগ)
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র রায়চৌধুরী

Approved by the Board of Secondary Education, West Bengal as a Text Book for Class VIII, Vide Notification No. Syl. 68/55/ dated 18. 10. 55 and Calcutta Gazette dated 24. 11. 55.

Revised according to the instruction of the Board of Secodary Education, West Bengl. Letter No. dt. 21. 10. 63. 27627/G

পৃথিবীর ইতিহাস

[আধুনিক যুগ]

(অষ্টম শ্রেণীর জন্য)

বঙ্কিমচন্দ্র রায়চৌধুরী

হাবড়া শ্রীচৈতন্য কলেজের, কলিকাতা ভিক্টোরিয়া ইন্স্টিটিউশনের কলিকাতা সেণ্ট পলস্ কলেজের, বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের ও ইটাচোনা মহাবিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ইতিহাসের, অধ্যাপক

সংশোধিত সংস্করণ

জানুয়ারী, [illegible]

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড

১, শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬

সূচীপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম :	পুনর্জন্ম ও ধর্মের সংস্কার	১—১৬
দ্বিতীয় :	ভৌগোলিক আবিষ্কার ও ইউরোপীয় সভ্যতার বিশ্বব্যাপী প্রভাবের সূচনা	১৭—২৭
তৃতীয় :	মোগল শাসিত ভারতবর্ষ	২৮—৪৭
চতুর্থ :	ইংলণ্ডে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের রাষ্ট্র বিপ্লব	৪৮—৫৭
পঞ্চম :	ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা	৫৮—৭২
ষষ্ঠ :	আমেরিকার বিপ্লব ও যুক্তরাষ্ট্রের সংগঠন	৭৩—৭৮
সপ্তম :	ফরাসী বিপ্লব	৭৯—৯১
অষ্টম :	শিল্প বিপ্লব	৯২—৯৯
নবম :	ইটালী ও জার্মানীতে রাষ্ট্রীয় একতার প্রতিষ্ঠা	১০০—১০৮
দশম :	আমেরিকায় ক্রীতদাসের স্বাধীনতা লাভ	১০৯—১১৪
একাদশ :	এশিয়া ও আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তার	১১৫—১২২
দ্বাদশ :	চীন ও জাপানের নবজাগরণ	১২৩—১৩৪
ত্রয়োদশ :	রুশ-বিপ্লব ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র	১৩৫—১৪৪

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
চতুর্দশ :	প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধ জাতিসংঘ ও সম্মিলিত জাতি সংগঠন	১৪৫—১৬১
পঞ্চদশ :	ভারত ও অন্যান্য ঔপনিবেশিক দেশের স্বাধীনতা লাভ— চীনের বিপ্লব	১৬২—১৭৫

পৃথিবীর ইতিহাস
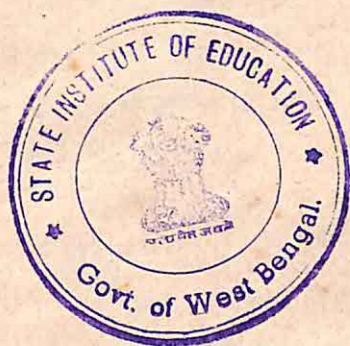
[আধুনিক যুগ]

প্রথম অধ্যায়

পুনর্জন্ম ও ধর্মের সংস্কার

রেনেসাঁস

রেনেসাঁস : আমাদের এই বইয়ের বিষয় হইল আধুনিক যুগের কথা। এই কথা বলিতে হইলে আমাদিগকে সর্বপ্রথম বলিতে হইবে রেনেসাঁসের কথা, কারণ (রেনেসাঁসের মধ্য দিয়াই মধ্যযুগের শেষ হয় এবং আধুনিক যুগ আরম্ভ হয়।)

(রেনেসাঁস কথাটি আসিয়াছে ফরাসী ভাষা হইতে। ইহার অর্থ হইল পুনর্জন্ম। ইউরোপীয় ইতিহাসে রেনেসাঁস বলিতে বুঝায় গ্রীক ও রোমক সংস্কৃতির পুনর্জন্ম এবং ঐ পুনর্জন্মের সুদূরপ্রসারী প্রভাব।) (গ্রীক ও রোমক সংস্কৃতি যাঁহারা সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাঁহারা ছিলেন অখৃষ্টান। মধ্যযুগের ইউরোপে খৃষ্টধর্মের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তাই গোঁড়া খৃষ্টানেরা গ্রীক ও রোমক সংস্কৃতির সকল চিহ্ন লোকচক্ষুর আড়াল করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। তাঁহাদের এই অবিবেচনার ফলে লোকে ঐ সংস্কৃতির কথা প্রায় ভুলিয়া যায়। কিন্তু মধ্যযুগের শেষের দিকে গ্রীক ও রোমক সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির সহিত তাঁহাদের আবার পরিচয় হইতে থাকে। পরিচয় যত নিবিড় হইতে থাকে, উহাদের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ ততই প্রবল হইয়া উঠে। তাঁহারা বিলুপ্তপ্রায় প্রাচীন সংস্কৃতি পুনরায় অনুশীলন করিতে আরম্ভ করেন। ফলে, ঐ সংস্কৃতি আবার প্রাণবন্ত হইয়া উঠে—উহার পুনর্জন্ম হয়।

গ্রীক ও রোমক সংস্কৃতির সহিত যাঁহাদের পরিচয় হয়, তাঁহাদের জীবনে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দেয়। তাঁহাদের জ্ঞানে ও

কর্মে নূতন প্রেরণা সঞ্চার হয়। এই প্রেরণার মূলমন্ত্র হইল স্বাধীনতাবোধ, জীবনের প্রতি অনুরাগ ও মানবের প্রতি প্রেম।

মধ্যযুগে স্বাধীনতার বিশেষ কোন প্রভাব ছিল না। ঐ যুগের লোকেরা ইচ্ছামত জীবনের পথে চলিতে পারিত না। তাহাদিগকে জমিদারের আদেশ, রীতিনীতির নির্দেশ, শাস্ত্রের অনুশাসন মানিতে হইত। তাহাদের জ্ঞানও ছিল সীমাবদ্ধ। ঐ জ্ঞানের সহিত শাস্ত্রের বিরোধ হইলে তাহাদিগকে শাস্ত্রের কথাই স্বীকার করিতে হইত; না করিলে তাহাদিগকে নির্যাতন, এমন কি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত সহ্য করিতে হইত।

মধ্যযুগে খৃষ্টীয় আদর্শের সহিত ইহজীবনের প্রীতির সম্পর্ক ছিল না। খৃষ্টান সাধু ও পুরোহিতগণ পার্থিব জীবনকে পাপ ও দুঃখের আকর বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল পরলোকের প্রতি। তাঁহারা মনে করিতেন শুধু ত্যাগ ও বৈরাগ্যের পথে চলিলেই ভগবানের প্রিয় হওয়া যায়।

গ্রীক ও রোমকেরা কিন্তু স্বাধীনতার মূল্য বুঝিতেন। তাঁহারা জীবনকে পরম সম্পদ বলিয়া মনে করিতেন এবং পরম আনন্দের সহিত ঐ সম্পদকে উপভোগ করিতে চাহিতেন। তাঁহাদের ঐ সব গুণ তাঁহাদের সাহিত্য, শিল্প, দর্শন প্রভৃতিতে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ সাহিত্য, শিল্প ও দর্শনের সহিত পরিচয়ের ফলে ইউরোপীয়দের মন মুক্তির আনন্দ লাভ করিল। তাহারা স্বাধীনতার মূল্য বুঝিতে পারিল। জীবনকে তাহারা আনন্দের নির্ঝর বলিয়া মনে করিতে লাগিল। পরলোকের আশায় তাহারা ঐ আনন্দ পরিহার করিতে সম্মত হইল না। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত, সুখ ও দুঃখের সহিত তাহাদের সংযোগ ও সহানুভূতি বাড়িতে লাগিল।

তাহাদের এই স্বাধীনতাবোধ, ইহজীবনের প্রতি এই অনুরাগ, মানুষের প্রতি এই প্রেম আধুনিক যুগের লোকের বিশেষত্ব। সুতরাং রেনেসাঁসের মাধ্যমেই আধুনিক মানুষের জন্ম হইল। এইদিক দিয়া দেখিতে গেলে ঐ আন্দোলনকে মানুষেরও পুনর্জন্ম বলা চলে।

আমরা এইমাত্র যে সব লোকের কথা বলিলাম, তাহাদিগকে বলা হইত হিউম্যানিস্ট বা মানবতাবাদী। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ইটালী এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশেও বহু হিউম্যানিস্টের জন্ম হয়। ইহারা গ্রীক ও রোমক সংস্কৃতির আদর্শে সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টি করেন; রাজনৈতিক চিন্তার পরিবর্তন করেন এবং বিজ্ঞানের উন্নতি করেন। ইহাদের অবদানের ফলে নব ইউরোপের সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপিত হয়। সুতরাং এইদিক দিয়া রেনেসাঁসকে ইউরোপীয় সংস্কৃতির পুনর্জন্ম বলা চলে। এই পুনর্জন্মে হিউম্যানিস্টদের কৃতিত্ব কত গভীর ও ব্যাপক ছিল তাহা পেট্রার্ক, মেকিয়াভেলি, র্যাফায়েল, বোকাসিও, মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, লিওনার্দো দা ভিন্‌চি, কোপারনিকাস ও গ্যালিলিও—এই কয়জন হিউম্যানিস্টদের কাজ আলোচনা করিলেই প্রমাণিত হইবে।

পেট্রার্ক

পেট্রার্ক ছিলেন পণ্ডিত ও কবি। তাঁহার গীতিকবিতাগুলির জন্য তিনি বিশেষভাবে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। ঐ সব

গীতিকবিতায় তিনি অলীক কল্পনার আশ্রয় লন নাই, প্রকৃত জীবনের ছবি আঁকিয়াছেন। গ্রীক ও রোমক সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগের অন্ত ছিল না। পার্থিব জীবনের প্রতিও তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তিনি বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া বহু মানুষের সঙ্গ লাভ করেন। তিনি সংগীত ও ফুলের বাগানের প্রতিও অনুরাগী ছিলেন। এই সব কারণে তাঁহাকে মানবতাবাদের পথপ্রদর্শক বলা হয়। তাঁহার জীবন ও কর্ম হইতে অন্যান্য মানবতাবাদীর জীবন ও কর্মের আদর্শ বুঝিতে পারা যায়।

বেকাসিও

বোকাসিও অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাদের মধ্যে প্রধান হইল 'ডেকামেরণ'। 'ডেকামেরণে' একশতটি গল্প আছে। এই সব গল্পে রহিয়াছে বোকাসিওর যুগের ইটালীয় জীবনের ছবি, আর রহিয়াছে মধ্যযুগের বহু আদর্শের প্রতি ব্যাঙ্গোক্তি।

মেকিয়াভেলি ছিলেন একজন ঐতিহাসিক ও রাজনীতিবিদ। তাঁহার সর্বপ্রধান রাজনৈতিক রচনার নাম 'দি প্রিন্স'। মেকিয়াভেলির সময় ইটালীর রাজনৈতিক একতা ছিল না, বিশেষ শক্তিও ছিল না। মেকিয়াভেলির অভিলাষ ছিল সমস্ত ইটালীকে একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করা। তিনি তাঁহার

মেকিয়াভেলি

'দি প্রিন্স' এ এই অভিলাষ সফল করিবার উপায় নির্দেশ করিয়াছেন।

লিওনার্দো দা ভিন্‌চি ছিলেন চিত্রকর, ভাস্কর, যন্ত্রকার, আরও অনেক কিছু। তাঁহার চিত্রের মধ্যে প্রধান হইতেছে 'মোনালিসা' (একটি সাধারণ মেয়ের ছবি), 'ভার্জিন অব দি রক্' (যীশুর জননী কুমারী মেরীর মূর্তি) এবং 'লাস্ট সাপার' (শিষ্যগণের সহিত যীশুর শেষ নৈশভোজনের দৃশ্য)।

মাইকেল অ্যাঞ্জেলো ছিলেন চিত্রকর, ভাস্কর, কবি ও রাজনীতিবিদ। তিনি ধর্মগুরু পোপের নির্দেশে রোমের সিস্টাইন চ্যাপেলের সিলিংএ ১৪৫ খানি চিত্র অঙ্কিত করেন। এইজন্য তাঁহাকে একটি উঁচু মঞ্চের উপর চিৎ হইয়া শুইয়া চারি বৎসর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। চিত্রগুলি তাঁহার অক্লান্ত কর্মশীলতা, অমিত জ্ঞান ও নিপুণতার নিদর্শন।

র‍্যাফায়েলও ছিলেন একজন বিশ্ববরেণ্য চিত্রকর। তাঁহার অঙ্কিত 'ম্যাডোনার' (যীশুর মাতা মেরীর) চিত্র অনেকের নিকটেই সুপরিচিত। র‍্যাফায়েল আরও অনেকগুলি পরমসুন্দর চিত্র অঙ্কিত করেন। ভেটিকানের (পোপের আবাসগৃহের) কয়েকটি কক্ষের চিত্রসজ্জা তাঁহারই কীর্তি।

স্থাপত্যঃ রেনেসাঁসের যুগে সাহিত্য ও ললিতকলার ন্যায় স্থাপত্যেরও উন্নতি হইয়াছিল। তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, মধ্যযুগের গথিক্ নামে স্থাপত্য পদ্ধতির প্রচলিত হয়। রেনেসাঁসের যুগে স্থপতিরা এই পদ্ধতি পরিহার করিয়া গ্রীক ও রোমক যুগের স্থাপত্যরীতি অনুসরণ করিতে আরম্ভ করেন। এই রীতি অনুসারে তাঁহারা অনেক হর্ম্য ও প্রাসাদ নির্মাণ করেন। ধর্মমন্দিরেও তাঁহারা এই রীতির প্রয়োগ করিতে দ্বিধা করিতেন না। এই কারণেই

আমরা রোমের সেন্ট পিটারে এবং মিলানের ধর্মমন্দিরে গ্রীক ও রোমক স্থাপত্যের সুনিবিড় প্রভাব দেখিতে পাই।

বৈজ্ঞানিক উন্নতি : রেনেসাঁসের প্রভাবে বৈজ্ঞানিক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। এই যুগের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইলেন কোপারনিকাস ও গ্যালিলিও।

কোপারনিকাস ছিলেন পূর্ব ইউরোপের অধিবাসী। তাঁহার সময়ে লোকের বিশ্বাস ছিল—সূর্য ও অন্যান্য গ্রহসকল পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। তিনি সর্বপ্রথমে প্রচার করেন পৃথিবীই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। তাঁহার এই মতের জন্য তাঁহাকে বর্তমান জ্যোতির্বিদ্যার পথপ্রদর্শক বলা হইয়া থাকে।

গ্যালিলিও ছিলেন ইটালীর অধিবাসী। গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায়

গ্যালিলিও

গ্যালিলিওর দূরবীক্ষণ যন্ত্র

তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের উন্নতি সাধন করেন এবং উহার সাহায্যে গ্রহ নক্ষত্রের অনেক রহস্য লক্ষ্য
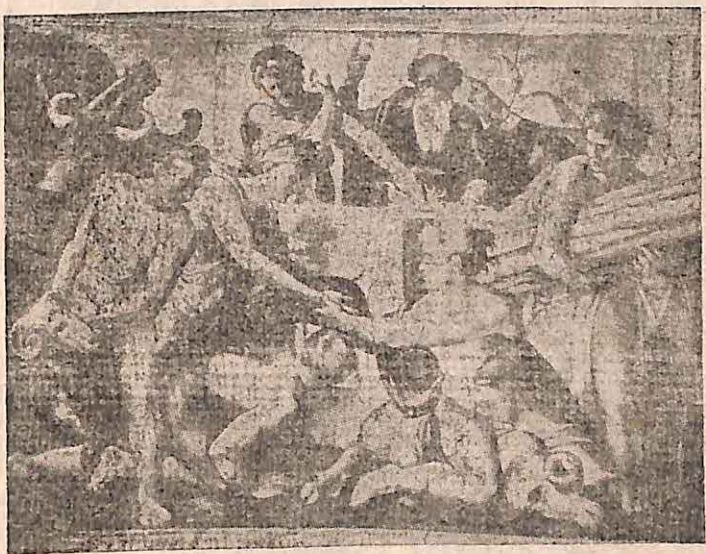
সিসটাইন চ্যাপেলের ছাদের সিলিং এর চিত্র ঃ
শিল্পী—মাইকেল অ্যাঞ্জেলো

ম্যাডোনা : শিল্পী—র‍্যাফায়েল

সেণ্টপিটার গীর্জা
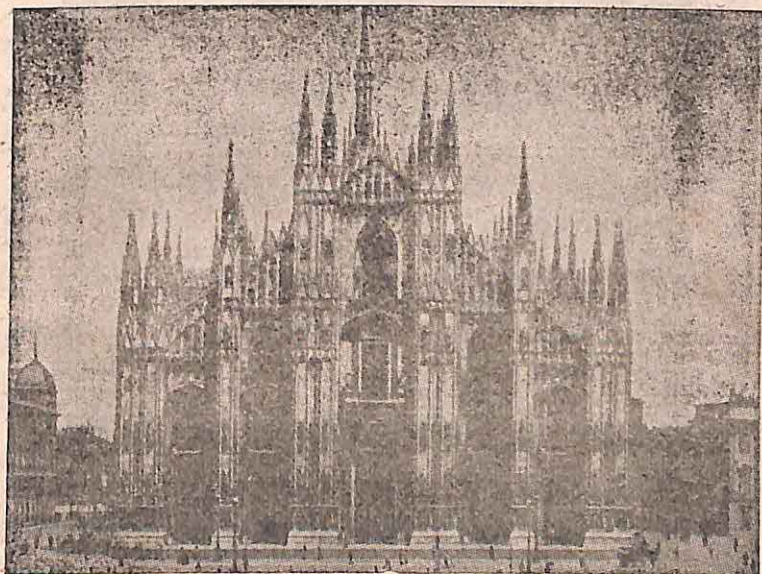
মিলানের ধর্ম্মমন্দির
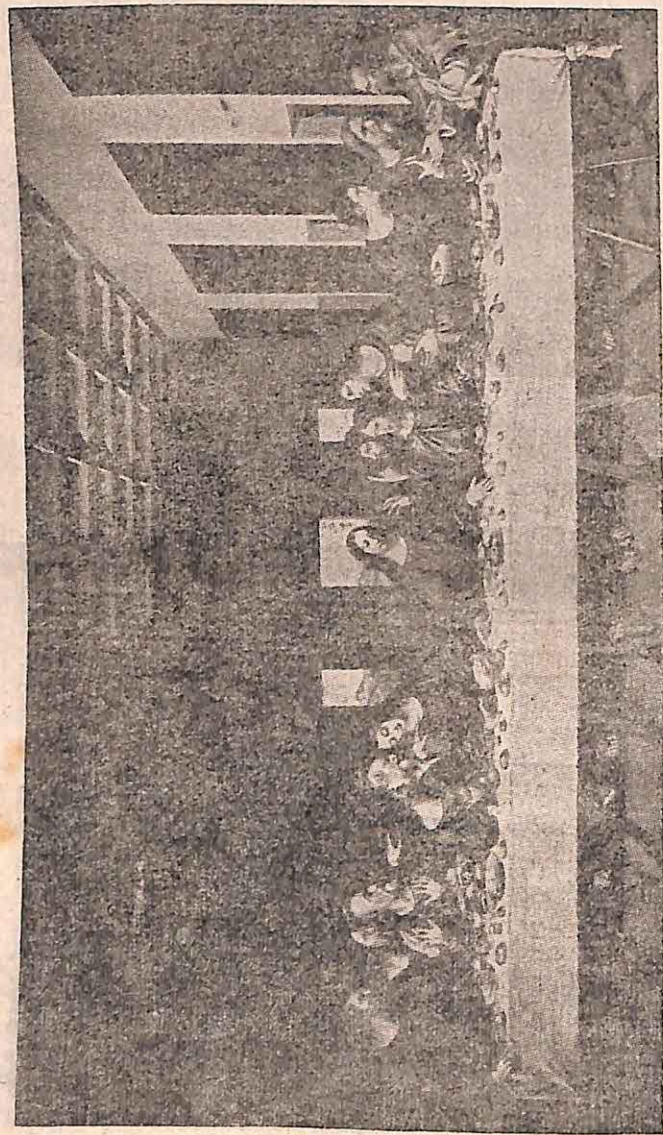
শিষ্যগণের সহিত যীশুর শেষ নৈশভোজনের দৃশ্য : শিল্পী—লিওনার্দো দা ভিনচি

করিতে সমর্থ হন। পৃথিবী যে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে তিনি কোপারনি-কাসের এই মত গ্রহণ করেন। ফলে, তিনি গোঁড়া খৃষ্টানদের কোপে পড়েন এবং কিছুকাল কারাগারে বাস করিতেও বাধ্য হন। কিন্তু তাঁহার প্রভাব ছিল এত বেশী যে, তাঁহাকে বেশীদিন বন্দী করিয়া রাখা সম্ভব হয় নাই। কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া তিনি আবার তাঁহার গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন।

আমরা রেনেসাঁসের কথা বলিলাম। এখন উহার আরম্ভ ও প্রসারের কথা বলিতেছি।

রেনেসাঁসের আরম্ভ ও প্রসার ঃ তোমরা মধ্যযুগের ইতিহাসে পড়িয়াছ যে তুর্কী জাতির অটোম্যান শাখার লোকেরা ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে পূর্ব রোমক সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্‌স্টান্টিনোপল জয় করিয়া লয়। কন্‌স্টান্টিনোপলে গ্রীক ও রোমক সংস্কৃতির সহিত সুপরিচিত বহু পণ্ডিত বাস করিতেন। ইঁহারা তুর্কীদের ভয়ে ইটালী ও উহার সন্নিহিত অঞ্চল সমূহে পলাইয়া আসেন, সঙ্গে লইয়া আসেন গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় লিখিত বহু পাণ্ডুলিপি। ইঁহাদের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া এবং ঐ সব পাণ্ডুলিপি পড়িয়া বহু ইউরোপীয় সুপ্রাচীন সংস্কৃতির সহিত পরিচয় লাভ করেন। এই কারণেই বহু ঐতিহাসিক মনে করেন কন্‌স্টান্টিনোপলের পতনের ফলেই রেনেসাঁসের সূচনা হয়। একথা সত্য যে, ঐ সব পণ্ডিতের অধ্যাপনার ফলে রেনেসাঁস বিশেষভাবে সক্রিয় হইয়া উঠে। কিন্তু আমাদিগের মনে রাখিতে হইবে কোন বড় পরিবর্তন একটি বিশেষ ঘটনার উপর নির্ভর করে না। বহুশক্তির বহুদিনব্যাপী সহযোগিতার ফলেই উহার আবির্ভাব সম্ভব হয়।

রেনেসাঁসের আয়োজন শুরু হইয়াছিল মধ্যযুগের শেষের দিকে। ঐ সময়ের লোকেরা তাহাদের পুরাতন ধারণায় আর তৃপ্ত থাকিতে চাহিল না। তাহাদের মধ্যে সত্যকে জানিবার ইচ্ছা ক্রমেই প্রবল

হইয়া উঠিতেছিল। তাহারা সংশয় করিতে, প্রশ্ন করিতে, সমালোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

ঐ সময়ে ইউরোপের বিভিন্নস্থানের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহাদের শিক্ষাপদ্ধতিতে অনেক ত্রুটি ছিল। শিক্ষার পরিধিও ছিল অতি সংকীর্ণ। তবু ইহাদের প্রভাবে বহুলোকের মনের অন্ধকার দূর হয় এবং রেনেসাঁসের অনুকূল পরিবেশ রচিত হয়।

রেনেসাঁসের আরম্ভ ইটালীতে। এই ঘটনাও বিস্মৃত হইবার কোন কারণ নাই। মধ্যযুগের শেষের দিকে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলগুলি বিশেষভাবে প্রভাবশালী হয়। এশিয়ার সহিত বাণিজ্যের ফলে ইটালীর ভেনিস, ফ্লোরেন্স, মিলান প্রভৃতি নগর রাষ্ট্রগুলি সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। সুতরাং উহাদের বহু নাগরিক গ্রীক ও রোমক সভ্যতার অনুশীলন করিতে সমর্থ হন। এই সব কারণে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে ইটালীর বহু অধিবাসীর মন ঐ সভ্যতার আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। ক্রমে ঐ আলোক ইটালী হইতে অন্যান্য দেশেও ছড়াইয়া পড়ে। রেনেসাঁসের এই প্রসার অনেক পরিমাণে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার বা পুনরাবিষ্কারের ফলে সম্ভব হইয়াছিল।

মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার ও পুনরাবিষ্কার : অতি প্রাচীনকালে কোন কোন স্থানে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন ছিল। কিন্তু ইহার কথা লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল। সুতরাং বই ছাপাইবার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। বইয়ের পাণ্ডুলিপির উপরই সকলকে নির্ভর করিতে হইত। এই পাণ্ডুলিপি হারাইয়া গেলে উহার পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব হইত। তাই ভাল ভাল বইয়ের পাণ্ডুলিপির নকল রাখা হইত। পাণ্ডুলিপি নকল করিতে অনেক সময় ও পরিশ্রম লাগিত। সুতরাং উহার সংখ্যা হইত অল্প এবং মূল্য হইত অত্যধিক। এই সব কারণে অতি অল্প লোকেরই ভাল ভাল লেখকদের লেখার সহিত পরিচয় হইবার সৌভাগ্য হইত।

রেনেসাঁসের যুগে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার হয়। পাণ্ডুলিপির উপর লোকের আর নির্ভর করিতে হইত না। তাহারা ছাপান বই পড়িতে পারিত। বইয়ের সংখ্যাও বাড়িতে লাগিল, দামও কমিয়া গেল। ভুলের সম্ভাবনাও হ্রাস পাইল। জ্ঞান আর অতি অল্পসংখ্যক ভাগ্যবান ধনীর মধ্যে নিবদ্ধ রহিল না। উহার প্রসার ক্রমেই বাড়িতে লাগিল এবং উহার প্রভাবে অধিকসংখ্যক লোক প্রভাবান্বিত হইল।

প্রাচীন মুদ্রাযন্ত্র

আমরা রেনেসাঁসের আরম্ভ ও উহার প্রসারের কথা বলিয়াছি। এইবার ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডে ইহার প্রভাবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি।

সেক্সপীয়র

এলিজাবেথ শাসিত ইংলণ্ড ও রেনেসাঁস: টিউডর বংশীয় সপ্তম হেনরীর রাজত্বকালে ইংলণ্ডে রেনেসাঁসের সূচনা হয়। কিন্তু ইহার পরিপূর্ণ বিকাশ হয় তাঁহার পৌত্রী এলিজাবেথের রাজত্বকালে। এই সময় ইংলণ্ডে বহু সুন্দর সুন্দর কবিতা ও নাটক রচিত হয়। নাট্যকারদের মধ্যে প্রধান ছিলেন **বিশ্ববরেণ্য সেক্সপীয়র**। তিনি বহু কবিতা-নাটক

রচনা করেন। তাঁহার নাটকগুলি ভাবে, ভাষায়, উপমায়, কল্পনায় এবং মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিশীল বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হইয়া রহিয়াছে।

ফ্রান্সিস বেকন

এই যুগের আর একজন ইংরাজ মনীষীর নাম হইতেছে ফ্রান্সিস বেকন। তিনি বহু বিষয় লইয়া ভাবগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁহার একখানি গ্রন্থে তিনি একটি আদর্শ সমাজেরও পরিকল্পনা করেন। এই সমাজের একটি প্রধান বিশেষত্ব হইতেছে বিজ্ঞানের উন্নতিসাধন।

হল্যাণ্ডের চিত্রকলা ঃ এইবার আমরা রেনেসাঁস যুগে হল্যাণ্ডের চিত্রকলার কথা বলিতেছি। এ কথা সত্য যে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে ঐ দেশে মধ্যযুগীয় চিত্রাঙ্কন রীতি প্রচলিত ছিল। ঐ সময়কার অঙ্কিত চিত্রগুলির মধ্যেও বাস্তব জীবনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

ইহাদের অনেকগুলিতে বহু শ্রেণীর মানুষ ও তাহাদের পোষাক-পরিচ্ছদের পরিচয় পাওয়া যায়। কালক্রমে এই চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির প্রভাব কমিয়া গেল এবং হল্যাণ্ডের চিত্রকলায় ইটালীয় প্রভাব সক্রিয় হইয়া উঠিল।

ধর্মসংস্কার ঃ রেনেসাঁসের প্রভাবে ইউরোপের সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞানে যে পরিবর্তন আসিয়াছিল আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এখন ধর্মের উপর উহার প্রতিক্রিয়ার আলোচনা করিতেছি। এই প্রতিক্রিয়ার প্রথম সূচনা হয় জার্মানীতে।

রেনেসাঁসের প্রেরণায় ইটালীর অধিবাসীরা ইহজীবনের

সুখ-ভোগের প্রতি আকৃষ্ট এবং প্রাচীনতর সভ্যতার প্রতি অনুরাগী হইয়া উঠে। কিন্তু আল্প্স পর্বতমালার উত্তরদিকের লোকদের মধ্যে ঐ আন্দোলনের প্রভাবে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা সঞ্চারিত হয়। উহার ফলে তাহারা তাহাদের ধর্মব্যবস্থাকেও সমালোচনা করিতে সংকোচ করে নাই। তাহাদের এই মনোভাবের ফলে প্রচলিত ধর্মব্যবস্থার সংস্কার অনিবার্য হইয়া উঠে।

পশ্চিম ও মধ্য-ইউরোপের অধিবাসীরা পোপকে তাহাদের গুরু বলিয়া স্বীকার করিত। সুতরাং তাঁহার ক্ষমতা ছিল একরকম সর্বব্যাপী। কিন্তু পোপ ও তাঁহার অধীনস্থ ধর্মনায়কদের কর্তব্যেরও অভাব ছিল না। এই কর্তব্যের মূল ছিল ত্যাগে, জ্ঞানে ও প্রেমে সকলের জীবন সুন্দর করিয়া তাহাদিগকে ভগবানের স্নেহের যোগ্য করিয়া তোলা।

দুঃখের বিষয় তাঁহারা এই আদর্শ রক্ষা করিতে পারেন নাই; যতই তাঁহাদের ভাণ্ডার অর্থে ভরিয়া উঠে, যতই তাঁহাদের মান বাড়িতে থাকে, ততই তাঁহারা যীশুর আদর্শ হইতে দূরে সরিয়া যান। তাঁহাদের মনে জ্ঞান ও ধর্মের আলোক নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। তাঁহারা বিলাসী হইয়া উঠেন, তাঁহারা পাপকে প্রশ্রয় দিতে থাকেন। তাঁহারা কুসংস্কারের সাহায্য লইতেও দ্বিধা করিতেন না। তাঁহারা প্রচার করেন, পোপ যীশুর প্রধান শিষ্য, সেণ্টপিটারের উত্তরাধিকারী। সেণ্টপিটারের হাতেই রহিয়াছে স্বর্গের চাবিকাঠি। সুতরাং যাহারা পোপের আদেশ অমান্য করিবে স্বর্গ তাহাদের নিকট শুধু মরীচিকাই হইয়া থাকিবে। পোপ তাঁহার ধর্মীয় প্রভাবের অন্যায় সুযোগ লইতেও দ্বিধা করিতেন না। ইংলণ্ডের রাজা জন একজন পোপের আদেশ অমান্য করিলে তিনি জনের প্রজাগণকে পর্যন্ত তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে আদেশ করেন।

শুধু ইংলণ্ডে নয়, পোপ জার্মানীতেও এইরূপ করিয়াছিলেন। এতদিন ধরিয়া জার্মানরা এইসব অন্যায় সহ্য করিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু রেনেসাঁসের প্রেরণায় তাহারা যখন সমালোচনাপ্রবণ হইয়া উঠিল তখন তাহারা আর পূর্বের মত সহিষ্ণু থাকিতে পারিল না। তাহাদের মধ্যে বিদ্রোহের পতাকা যিনি তুলিয়া ধরিলেন, তিনি নিজেই ছিলেন একজন সন্ন্যাসী। তাঁহার নাম মার্টিন লুথার।

১০। লুথার ও ধর্মসংস্কার ঃ ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে পোপের একজন কর্মচারী জার্মানীতে 'ক্ষমাপত্র' বিক্রয় করিতে আসেন। যে ঐ 'ক্ষমাপত্র' ক্রয় করিত সে পোপের নিকট হইতে তাহার কৃতপাপ হইতে মুক্তির প্রতিশ্রুতি পাইত। ঐ পত্রে সেই প্রতিশ্রুতির উল্লেখ থাকিত। উহার বলে সে অনায়াসে স্বর্গে চলিয়া যাইতে পারিবে বলিয়া পোপের কর্মচারী তাহাকে আশ্বাস দিতেন।

মার্টিন লুথার

লুথার এই অন্যায় সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি প্রকাশ্যে ইহার প্রতিবাদ করিলেন। ফলে পোপের পক্ষীয় লোকদের সহিত তাঁহার মতান্তর আরম্ভ হইল। এই মতান্তর ক্রমেই তীব্র হইয়া উঠিল। শেষে লুথার পোপের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন এবং জার্মানীর বড় বড় পরিবারের লোকদিগকে ঐ বিদ্রোহে যোগদান করিতে আহ্বান করিলেন। পোপ লুথারকে তাঁহার এই উক্তিগুলি প্রত্যাহার করিতে আদেশ দিলেন এবং তাঁহাকে জানাইলেন, তিনি ঐরূপ না করিলে তাঁহাকে ধর্মপ্রতিষ্ঠান হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে। লুথার প্রকাশ্যে ঐ আদেশপত্র আগুনে পোড়াইয়া উহার

প্রতি তাঁহার তাচ্ছিল্যের পরিচয় দিলেন। ইহার কিছুকাল পরে পোপের অনুবর্তী জার্মান সম্রাট তাঁহাকে সাধারণের শত্রু বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই ঘোষণার বলে যে কোন লোক তাঁহাকে হত্যা করিবার অধিকার লাভ করিল। লুথারকে কিন্তু হত্যা করা সম্ভব হইল না। একজন বড়লোক তাঁহাকে নিজের দুর্গে আশ্রয় দিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিলেন।

সম্রাট চার্লস ফরাসীদেশের রাজার সহিত যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। সুতরাং তিনি লুথারের বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু করিতে পারিলেন না। লুথার দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া তাঁহার আন্দোলনকে ক্রমেই শক্তিশালী করিয়া তুলিলেন। অবশেষে চার্লস ঐ আন্দোলনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সংকল্প করিলেন। কিন্তু লুথারের দলের লোকেরা তাঁহার এই সংকল্পের বিরোধিতা করিল। তাহাদের প্রতিবাদ-পত্র হইতে তাহাদের নাম হয় Protestant বা প্রতিবাদী।

চার্লস প্রোটেস্ট্যাণ্ট মতবাদ ধ্বংস করিতে বহু চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হয়। অবশেষে তিনি ঐ মতবাদ আইনসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হন।

লুথারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আরও অনেকে পোপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। ইহারা লুথার অপেক্ষা চরমপন্থী। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছেন ক্যালভিন।

ক্যালভিন ঃ ক্যালভিন ছিলেন ফরাসী দেশের অধিবাসী, কিন্তু তাঁহার কর্মক্ষেত্র ছিল সুইট্জারল্যাণ্ডের জেনেভা নগরী। তিনি জেনেভার শাসনভার লাভ করেন এবং উহাকে 'ঈশ্বরের নগরী' করিয়া তুলিতে প্রাণপণ যত্ন করেন। তিনি নির্মমভাবে নাগরিকগণকে ধর্ম ও নীতির পথে অচঞ্চল রাখিতে চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি

নাট্যশালা বন্ধ করিয়া দেন এবং নৃত্যগীত, এমন কি শপথ করা পর্যন্ত নিষিদ্ধ করেন।

ক্যালভিন ছিলেন একজন খাঁটি সংস্কারক। তিনি তাঁহার আদর্শে অবিচলিত ছিলেন। তিনি কঠোর জীবন যাপন করিতেন। তিনি অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করিতেন। তিনি যাহা মিথ্যা বলিয়া বুঝিতেন, তাহার সহিত কখনও আপোষ করিতেন না। আবার তাঁহার গোঁড়ামিরও অন্ত ছিল না। কেহ তাঁহার মত গ্রহণ না করিলে, তিনি কোনক্রমেই তাহাকে ক্ষমা করিতেন না। কেহ তাঁহার আদেশ অমান্য করিলে তিনি তাহার প্রতি মৃত্যুদণ্ড দিতেও দ্বিধা করিতেন না। ক্যালভিনের কিন্তু গুণেরও অভাব ছিল না। তাঁহার চরিত্রে ছিল অশেষ বল, মনে ছিল অমিত তেজ। এইসব গুণের জন্য তাঁহার মতবাদ জেনেভায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

ক্যালভিন

ইংলণ্ডে প্রোটেস্ট্যাণ্ট মতবাদঃ অষ্টম হেনরীর রাজত্বকালে প্রোটেস্ট্যাণ্ট মতবাদ ইংলণ্ডেও প্রবেশ করে। হেনরী পোপ নিয়ন্ত্রিত ক্যাথলিক ধর্মের বিরোধী ছিলেন না। তাঁহার বিরোধ ছিল পোপের সহিত। তিনি তাঁহার স্ত্রীর সহিত বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়া আর একটি মেয়েকে বিবাহ করিতে সংকল্প করেন। এইজন্য পোপের অনুমতির প্রয়োজন হয়। পোপ এই অনুমতি দিতে সম্মত হইলেন না। তখন হেনরী পার্লামেণ্টের সাহায্যে আইন করিয়া ইংলণ্ডের ধর্মীয় ব্যাপারে পোপের কর্তৃত্ব উঠাইয়া দিয়া রাজার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা

করেন। তিনি ইংলণ্ডের বহু মঠ ভাঙ্গিয়া দেন এবং উহাদের সঞ্চিত অর্থ আপনার প্রোটেস্ট্যান্ট বন্ধু ও অনুচরদের মধ্যে বিলাইয়া দেন। তাঁহার শাসনকালে বাইবেল ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হয়। এইরূপে ইংলণ্ডে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়।

ইংলণ্ডের প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম কিন্তু ইউরোপে প্রচলিত প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের অনুরূপ নহে। এই ধর্মে পোপের শাসন নাই, কিন্তু পোপ শাসিত ক্যাথলিক ধর্মের মূল নীতিগুলি রহিয়াছে। হেনরী ঐ সকল মূলনীতি অমান্য করিতেন না। যাহারা ইহাদিগকে অমান্য করিত, তিনি তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি দিতে দ্বিধা করিতেন না।

ধর্মসংস্কারের ফলাফল ঃ ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলে কতকগুলি নূতন ধর্ম সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। ফলে এতদিন ধরিয়া পশ্চিম ও মধ্য-ইউরোপে যে ধর্মীয় ঐক্য ছিল তাহার বিলোপ সাধিত হয়। ঐক্যের পরিবর্তে আরম্ভ হয় ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে কলহ। কলহ পরিণত হয় রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে। এ সংগ্রামের ফলে অগণিত লোক নিহত হয়। শত শত জনপদ শ্মশানে পরিণত হয়। বহু বৎসর পরে ইউরোপীয়েরা আপনাদের ভুল বুঝিতে পারে এবং পরস্পরের ধর্মমতের প্রতি সহিষ্ণুতার নীতি গ্রহণ করিয়া শান্তি লাভ করে।

সমসাময়িক ভারতবর্ষে ও চীনে ধর্মের উদারতা ঃ এই সময় ভারতবর্ষ ও চীনেও একাধিক ধর্ম প্রচলিত ছিল। কিন্তু ঐ দুই দেশে ইউরোপের মত ধর্ম লইয়া রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয় নাই। উহাদের অধিবাসীরা বহুল পরিমাণে ধর্ম ব্যাপারে সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছে। কাজেই তাহাদিগকে ইউরোপীয়দিগের মত ধর্মযুদ্ধের বিভীষিকার সম্মুখীন হইতে হয় নাই।

কালপঞ্জী

খৃঃ পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতক		রেনেসাঁসের যুগ
খৃঃ	১৪৫৩	কনস্ট্যান্টিনোপলের পতন
খৃঃ	১৫১৭	লুথারের ক্ষমাপত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ
খৃঃ	১৫২৯—৩৬	অষ্টম হেনরী কর্তৃক ইংলণ্ডে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মের প্রতিষ্ঠা
খৃঃ	১৫৪১	ক্যালভিনের জেনেভায় প্রতিষ্ঠালাভ
খৃঃ	১৫৫২	পঞ্চম চার্লসের প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মমত আইনসঙ্গত বলিয়া স্বীকার।

অনুশীলনী

১। রেনেসাঁস বলিতে কি বুঝায়? উহার ফলে ইউরোপীয়দের কি কি উপকার হয়?

২। কনস্ট্যান্টিনোপলের পতনের ফলে রেনেসাঁসের আরম্ভ হইয়াছিল; একথাটি কতদূর সত্য?

৩। কি কারণে রেনেসাঁস ইটালীতে আরম্ভ হয়?

৪। রেনেসাঁসের প্রসারে মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাব বর্ণনা কর।

৫। হিউম্যানিস্ট কাহারা? কেন তাহাদিগকে ঐরূপ বলা হয়?

৬। রেনেসাঁসের ফলে কি ভাবে মধ্যযুগের ইউরোপীয়রা আধুনিক মানুষে রূপান্তরিত হয়?

৭। পেট্রার্ক, মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, লিওনার্দো দা ভিন্‌চি এবং সেক্সপীয়রের কাজের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৮। রেনেসাঁসের সহিত ধর্মসংস্কারের সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর।

৯। জার্মানীতে কি ভাবে ধর্মসংস্কার আন্দোলন হয়?

১০। ধর্মসংস্কার আন্দোলনে লুথারের অবদান বর্ণনা কর।

১১। কি ভাবে ক্যালভিন জেনেভাকে দিব্য নগরে রূপান্তরিত করিতে চাহিয়াছিলেন?

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভৌগলিক আবিষ্কার ও ইউরোপীয় সভ্যতার বিশ্বব্যাপী প্রভাবের সূচনা

রেনেসাঁসের ফলে ইউরোপীয়দের কেবলমাত্র জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি হয় নাই, তাহাদের কর্ম-ক্ষেত্রেরও প্রসার হয়। এই অধ্যায়ে আমরা ঐ প্রসারের কথা বলিব।

রুদ্ধদ্বার ও তাহার উন্মোচন ঃ মধ্যযুগে ইউরোপীয়দের সহিত বিদেশের বিশেষ সংযোগ ছিল না। অবশ্য তাহারা বিদেশে গিয়া 'ধর্মযুদ্ধ' করিয়াছিল। কিন্তু 'ধর্মযুদ্ধ' সাধারণ ঘটনা নয়।

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে কয়েকজন খৃষ্টীয় প্রচারক ও বণিক সুদূর প্রাচ্যে গমন করেন। **মার্কোপোলো** ইহাদের অন্যতম। মার্কোপোলো মঙ্গোলীয় মরুভূমি পার হইয়া চীন সাম্রাজ্যে প্রবেশ করেন। প্রায় কুড়ি বৎসর পরে তিনি এশিয়ার বহুদেশ ঘুরিয়া ইটালীতে ফিরিয়া আসেন। অনেকে মার্কোপোলোর দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতে ব্যস্ত হন। কিন্তু তখন চীনে এক নূতন রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। ইহারা বিদেশীদের ভালচক্ষে দেখিতেন না। এই সময় আবার পশ্চিম এশিয়ায় তুর্কিজাতির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তুর্কিরা অমুসলমানদের প্রতি মোটেই সদয় ছিল না। এইসব কারণে ইউরোপ হইতে বিদেশে ভ্রমণ করা কঠিন হইয়া উঠে এবং ইউরোপীয় কর্মধারা ইউরোপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে।

মধ্যযুগের শেষের দিকে এই 'রুদ্ধদ্বার' খুলিয়া যায়। ইউরোপীয়রা অজানা জলপথ আবিষ্কারের অভিযান আরম্ভ করে

তাহাদের মধ্যে কাহারো কাহারো লক্ষ্য ছিল বিদেশে যীশুর বাণী প্রচার করা, কিন্তু অনেকেরই ইচ্ছা ছিল বিদেশে বাণিজ্য করিয়া ধনী হওয়া।

এই সময় ইউরোপীয়দের ভৌগোলিক জ্ঞানেরও উন্নতি হয়। পৃথিবী যে গোলাকার এই সত্য তাহারা বুঝিতে পারে। পূর্বে তাহাদের ধারণা ছিল পৃথিবীর আকার চেপ্টা। তাহাদের ভয় ছিল তাহারা ইহার প্রান্তে গিয়া পৌঁছিলে ইহার বাহিরে পড়িয়া যাইবে। এখন আর ঐ ভয় রহিল না।
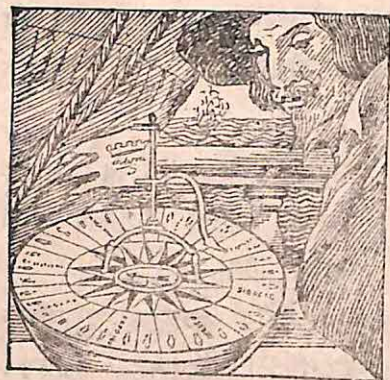
কম্পাস (প্রায় ১৪৯২)

বহুকাল পূর্বে চীনদেশে একরকমের দিক্‌নির্ণয়ের যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মধ্যযুগের শেষের দিকে ইউরোপীয়েরা ঐ যন্ত্রের উন্নতি সাধন করে। তাহারা অক্ষরেখার অনেকটা পরিমাপ করিতেও সমর্থ হয়। তাহারা মানচিত্রেরও উন্নতি সাধন করে। মার্কোপোলোর বিবরণ পড়িয়া এশিয়ার কয়েকটি দেশ সম্বন্ধেও তাহাদের অনেকটা ধারণা জন্মে।

ভৌগলিক অভিযানের লক্ষ্য ঃ এই সব সম্বল করিয়া তাহারা রওনা হয় মহাসমুদ্রের মধ্য দিয়া, তাহাদের লক্ষ্যের অভিমুখে। এই লক্ষ্য ছিল এশিয়ার কয়েকটি বিশেষ বিশেষ স্থান। ইহাদের মধ্যে প্রধান হইল চীন, জাপান, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপমালা ও ভারতবর্ষ। মার্কোপোলোর বিবরণ হইতে তাহারা চীন ও জাপানের অমিত ঐশ্বর্যের কথা শুনিয়াছিল।

পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রচুর মশলা জন্মিত। 'ক্রুসেডে'র (ধর্মযুদ্ধের) সময় হইতে তাহারা এই মশলার ব্যবহার শিক্ষা করে।

ভারতবর্ষের সহিত অতি প্রাচীন কাল হইতেই তাহাদের প্রত্যক্ষ বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। পশ্চিম ভারতের বহু বন্দর হইতে বহু জাহাজ রোমক সাম্রাজ্যের বহু বন্দরে পণ্য বহন করিয়া লইয়া যাইত।

নূতন জলপথ অনুসন্ধানের কারণ ঃ মধ্যযুগে আরবীয় মুসলমানেরা ভারতবর্ষের সহিত ইউরোপের বাণিজ্যের উপর কর্তৃত্ব করিতে আরম্ভ করে। তাহারা লেভাণ্টে ভারতীয় পণ্য বহন করিয়া লইয়া যাইত, আর সেখান হইতে ইটালীর ভেনিস, জেনোয়া প্রভৃতি নগরের বণিকেরা ঐ পণ্য চড়া দরে পশ্চিম ইউরোপের বণিকদের নিকট বিক্রয় করিত। এই ব্যবস্থায় পশ্চিম ইউরোপের বণিকেরা সুখী হইত না। তাহারা চাহিত সরাসরি ভাবে ভারতের সহিত বাণিজ্য করিতে। তাহারা জানিত ঐরূপ করিলে আরবীয় এবং ইটালীয় বণিকেরা যে মুনাফা করিতেছে তাহা তাহাদেরই হইবে।

এই অবস্থায় ইউরোপীয়েরা একটি নূতন জলপথ আবিষ্কারের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। কিন্তু এই জলপথ কোথায় এ বিষয় তাহারা একমত হইতে পারিল না। কেহ বলিল, এই পথ সন্ধান করিতে হইলে আফ্রিকার উপকূল দিয়া যাইতে হইবে, আর কেহ বলিল ঐ পথ রহিয়াছে ইউরোপের পশ্চিমে। যাহারা আফ্রিকার উপকূল দিয়া চলিল, তাহারা ভারতবর্ষে যাইবার জলপথ আবিষ্কার করিল, আর যাহারা ইউরোপের পশ্চিমদিক হইতে রওনা হইল, তাহারা আবিষ্কার করিল আমেরিকা।

ভৌগোলিক অভিযানের নেতৃত্ব ঃ পথ আবিষ্কার করিতে কিন্তু একাধিক অভিযানের প্রয়োজন হইয়াছিল। এই সময় ইটালীর নগর রাষ্ট্রগুলি নিজেদের মধ্যে কলহ করিয়া দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং দূরদেশ আবিষ্কারের প্রয়োজনীয় অভিযান পরিচালনা করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইল না। অন্যদিকে স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি আটলান্টিক মহাসাগরের নিকটবর্তী দেশসমূহ জাতীয় ভাবের প্রেরণায় ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ সব দেশের রাজা ও ধনী নাগরিকরাই বিদেশে অনুসন্ধানের অভিযান পাঠাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ঐ সব অভিযানের ফলে লাভবান হন।

ভারতবর্ষে যাইবার জলপথ আবিষ্কার ঃ ভারতবর্ষে যাইবার জলপথ পর্তুগালের রাজপরিবারের লোকদের অনুপ্রেরণার ফলে আবিষ্কৃত হয়। ইহাদের মধ্যে সর্বাগ্র গণ্য হইলেন প্রিন্স হেনরী। প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরিয়া তিনি ঐ কাজে তাঁহার শক্তি ও সময় নিয়োজিত করেন। তাঁহার উৎসাহের ফলে বড় বড় জাহাজ নির্মিত হয়, পূর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য মানচিত্র রচিত হয় এবং আফ্রিকার উপকূলে একাধিক অভিযান প্রেরিত হয়। এইসব অভিযানের ফলে পর্তুগীজ নাবিকেরা সেনেগাল নদীর পরপারেও আগাইয়া যায়।

ঐ স্থানে আসিয়াই পর্তুগীজ নাবিকেরা ক্ষান্ত হইল না। ১৪৮৬-৮৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বার্থলোমিইডিয়াজ দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ পর্যন্ত পার হইয়া যান। ইহার পর ভাস্কো-ডা-গামা ঐ অন্তরীপ পার হইয়া ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের কালিকট বন্দরে উপস্থিত হন।

পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ঃ ভাস্কো-ডা-গামার অভিযানের ফলে পূর্বদেশের সহিত বাণিজ্য করিবার জন্য পর্তুগালের লোকেরা অধীর হইয়া উঠে। অল্পকালের মধ্যেই এশিয়ার সহিত তাহাদের

নিয়মিত বাণিজ্য আরম্ভ হয়। যাহারা এই বাণিজ্যে বাধা দেয় তাহাদের পরাজয় হয়। সিংহলের এবং ভারতবর্ষের বহুস্থানে তাহাদের উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ঐ উপনিবেশ-গুলি রাজনৈতিক প্রভাবেরও ঘাঁটি হইয়া উঠে। এইরূপে অল্পকালের মধ্যেই বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে ক্ষুদ্রকায় পর্তুগাল একটি বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হয়।

ভাস্কো-ডা-গামা

আমেরিকা আবিষ্কার : পর্তুগালের প্রতিবেশী স্পেনও বিদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া প্রায় ঐ সময়ই আর একটি সাম্রাজ্য হইয়া উঠিল। যিনি ঐ সাম্রাজ্যের পথ খুলিয়া দিলেন, তাঁহার নাম ক্রিস্টোফার কলম্বাস।

কলম্বাস

কলম্বাস ছিলেন ইটালীর অন্তর্গত জেনোয়া নগরের অধিবাসী। তাঁহার বিশ্বাস ছিল এশিয়া মহাদেশে যাইতে হইলে ইউরোপের পশ্চিমে অভিযান করিতে হইবে। স্পেনের রাজা ও রানীর সহায়তা লাভ করিয়া তিনি ১৪৯২ খৃষ্টাব্দের ৩রা আগস্ট স্পেনের

গ্রীনল্যাণ্ড
উত্তর আমেরিকা
আটলাণ্টিক মহাসাগর
ইংলণ্ড
ইউরোপ
ফ্রান্স
স্পেন
এ শি য়া
মঙ্গোলিয়া
পিকিং
জাপান
প্রশান্ত মহাসাগর
ইষ্ট ইণ্ডিজ
চী ন
ম্যাকাও
ফিলিপাইন
ওরমুজ
দিউ
ভারত
আফ্রিকা
ভার্জিনিয়া
ফ্লোরিডা
নিউ স্পেন
প্রশান্ত মহাসাগর
পোর্টো বেলো
ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ
দাক্ষিণ আমেরিকা
আটলাণ্টিক মহাসাগর
উত্তমাশা অন্তরীপ
ভারত মহাসাগর
সুমাত্রা
জাভা
নিউ গিনি
অষ্ট্রেলিয়া
ম্যাগেলান প্রণালী
পর্তুগীজ
-x-x- ভাস্কোডাগামা ১৪৯৭-৯৮
বাণিজ্য পথ
ইংলিশ
জন ক্যাবট ১৪৯৭-৯৮
ড্রেক ১৫৭৭-৮০
স্পেন
কলম্বাস ১৪৯২
ম্যাগেল্যান ১৫১৯-২২
বাণিজ্য পথ
মার্কোপোলো ১২৭১-৯৫
আবিষ্কার যাত্রা

হইতে পশ্চিম দিকে যাত্রা করেন। প্রায় আড়াই মাস কাল অজানা আটলান্টিক মহাসাগরের তরঙ্গমালার সহিত সংগ্রাম করিয়া তিনি আমেরিকার উপকূলের একটি দ্বীপে উপনীত হন। তিন মাসকাল ধরিয়া কলম্বাস ঐ দ্বীপের সন্নিহিত আরও একাধিক দ্বীপ আবিষ্কার করিয়া দিগ্বিজয়ীর গৌরব লইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন।

আমেরিকায় তিনি আরও তিনটি অভিযানের নেতৃত্ব করেন। তিনি অনেকগুলি দ্বীপ আবিষ্কার করেন এবং দক্ষিণ আমেরিকার বিশাল ভূখণ্ডের অতি নিকটে উপনীত হইবারও সৌভাগ্য লাভ করেন। তাঁহারই সাধনার ফলে আমেরিকার ও পরে অস্টে.লিয়ার আবিষ্কার সম্ভব হয়। কলম্বাস কিন্তু জানিতেন না যে, তিনি একটি নূতন মহাদেশের আবিষ্কার সম্ভব করিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁহার বিশ্বাস ছিল তিনি ভারতবর্ষের উপকূলে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। আমেরিকার নামের মধ্যেও তাঁহার স্মৃতির সংযোগ নাই। ঐ নাম হইয়াছে ফ্লোরেন্সের একজন নাবিকের নামানুসারে। ইনি হইলেন আমেরিগো ভেস্-পুচী। তিনি ১৩৯৭ খ্রীষ্টাব্দে নূতন মহাদেশের অভিমুখে রওনা হন। তিনি দাবী করেন যে, তিনি উত্তর আমেরিকার উপকূলে উপস্থিত হন। যে আশা লইয়া কলম্বাস অভিযান করিয়াছিলেন তাহা কিন্তু অপূর্ণ থাকে নাই। তাঁহার এই আশা যিনি সফল করেন তাহার নাম ম্যাজেল্যান।

ম্যাজেলানের অভিযানঃ ম্যাজেল্যান ছিলেন পর্তুগালের অধিবাসী। কিন্তু তিনি কাজ করিতেন স্পেন সরকারের অধীনে। মাত্র পাঁচখানা অতি জীর্ণ জাহাজ লইয়া ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে ম্যাজেল্যান স্পেনের সেভিল বন্দর হইতে পশ্চিমদিকে যাত্রা করেন এবং আটলান্টিক মহাসমুদ্র পার হইয়া দক্ষিণ আমেরিকার প্রান্তে উপনীত হন। ঐ স্থানে তিনি একটি সংকীর্ণ জলপ্রণালী দেখিতে পান।

তাঁহার নামানুসারে ঐ প্রণালীর নাম হয় ম্যাজেল্যান প্রণালী। ম্যাজেল্যান ঐ প্রণালী ধরিয়া চলিতে থাকেন। চলিতে চলিতে তিনি একটি মহাসমুদ্রে আসিয়া পড়েন। তাঁহার মনে হয় এই মহাসমুদ্র আটলান্টিক মহাসমুদ্র অপেক্ষা শান্ত, তাই তিনি উহার নাম দেন 'প্রশান্ত মহাসাগর'।

ম্যাজেলান

ম্যাজেল্যান এই নূতন মহাসাগরের মধ্য দিয়া নির্ভয়ে চলিতে লাগিলেন এবং শেষে ফিলিপাইন দ্বীপমালায় আসিয়া পৌঁছাইলেন। এই স্থানের অধিবাসীদের সহিত একটি যুদ্ধে তিনি নিহত হন। কিন্তু তাঁহার ১৮ জন সহযাত্রী সেভিল বন্দরে ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হয়। এইরূপে পৃথিবীর প্রথম প্রদক্ষিণ সম্পন্ন হয়।

পোপের মধ্যস্থতাঃ অজানা পথ আবিষ্কারের ফলে পৃথিবী সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। কিন্তু জ্ঞান বাড়িবার ফলে প্রথমে শান্তি আসিল না; আসিল বিরোধের সম্ভাবনা। ঐ সম্ভাবনা উপস্থিত হইল পর্তুগাল ও স্পেনের মধ্যে, বিদেশে বাণিজ্য ও রাজ্য বিস্তারকে কেন্দ্র করিয়া। ঐ সম্ভাবনা দূর করিবার উদ্দেশ্যে ধর্মগুরু পোপ পৃথিবীর মানচিত্রে একটি রেখা টানিয়া দিলেন। তিনি আদেশ করিলেন এই রেখার পূর্বদিকের সকল ভূখণ্ডে পর্তুগালের এবং পশ্চিমে সকল স্থান স্পেনের অধিকারে থাকিবে। তাঁহার এই মধ্যস্থতার ফলে পর্তুগাল, এশিয়া ও আফ্রিকায় এবং স্পেন আমেরিকায় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার সুযোগ পাইল।

স্পেনের মেক্সিকো ও পেরু অধিকার : আমরা পূর্বেই বলিয়াছি কলম্বাসের বিশ্বাস ছিল তিনি ভারতবর্ষের উপকূলে পৌঁছাইয়াছেন। এই কারণে তিনি যে সকল দ্বীপ আবিষ্কার করেন, তাহাদের অধিবাসিগণকে বলিতেন ভারতীয় বা ইণ্ডিয়ান। ক্রমে এই নাম আমেরিকার সকল আদিম অধিবাসীর প্রতি প্রযুক্ত হইল। ঐ সব অধিবাসীর গায়ের রং ছিল লাল্‌চে। তাহারা লাল রংয়ের উল্কিও পরিত। তাই উহাদিগকে 'রেড ইণ্ডিয়ান'ও বলা হইত।

তখনকার রেড ইণ্ডিয়ানদের অনেকে কিন্তু সভ্যতার পথে বহুদূর আগাইয়া গিয়াছিল। তাহাদের দুইটি বিশাল সাম্রাজ্য ছিল, প্রথমটি ছিল মধ্য আমেরিকায় বর্তমান মেক্সিকোতে; দ্বিতীয়টি ছিল দক্ষিণ আমেরিকায় বর্তমান পেরুতে। দুইটি সাম্রাজ্যই ছিল সম্পদ ও সংস্কৃতির লীলাভূমি।

কিন্তু উহাদের অধিবাসীদের মধ্যে একতা ছিল না, স্পেনীয়দের মত তাহারা ঘোড়ায় চড়িয়া ও লোহার বর্ম পরিয়া যুদ্ধ করিতে জানিত না। কামানের ব্যবহারও তাহাদের জানা ছিল না। তাই তাহারা স্পেনীয়দের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। প্রথম সাম্রাজ্যটি ধ্বংস করেন কোর্টিস এবং দ্বিতীয় সাম্রাজ্যটি ধ্বংস করেন পিজারু। মেক্সিকো ও পেরু জয় করিয়া এবং ঐ দুইটি সাম্রাজ্যের অমিত সম্পদ লাভ করিয়া স্পেন পশ্চিম ইউরোপে বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠে।

ইংরেজ, ওলন্দাজ ও ফরাসীদের উপনিবেশ বিস্তার : পর্তুগাল ও স্পেনের সাম্রাজ্য কিন্তু দীর্ঘদিন স্থায়ী হইল না। তাহাদের সম্পদ ও পরাক্রম দেখিয়া হল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের অধিবাসীরাও বিদেশে বাণিজ্য বিস্তার করিতে অধীর হইয়া উঠিল। ওলন্দাজরা (হল্যাণ্ডের অধিবাসী), আফ্রিকার দক্ষিণ-উপকূলে, সিংহল দ্বীপে পূর্বভারতীয় দ্বীপমালায় এবং ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করিতে

আরম্ভ করে। রানী এলিজাবেথের রাজত্বকালে ইংরেজরা স্পেনের প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া আমেরিকায় বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করে। পরে তাঁহারা আমেরিকার উত্তর উপকূলে কতকগুলি উপনিবেশও গড়িয়া তোলে।

সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভে ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্য করিবার জন্য তাহারা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে একটি বাণিজ্য সংঘের প্রতিষ্ঠা করে। পর্তুগীজ ও ওলন্দাজদের প্রতিরোধ চূর্ণ করিয়া এবং মুঘল সম্রাটদের নিকট হইতে সুবিধার পর সুবিধা লাভ করিয়া এই বাণিজ্য সংঘটি ক্রমেই শক্তিশালী হইয়া উঠে। ক্রমে ইহার নেতৃত্বে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্য কুঠী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কুঠীগুলি পরে রাজনৈতিক প্রভাবেরও কেন্দ্র হইয়া উঠে। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে ফরাসীরাও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে একটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত করে। ইহার নিয়ন্ত্রণে পন্দীচেরী, চন্দননগর, মসলিপট্টম, প্রভৃতি স্থানে কুঠী নির্মিত হয়। আমেরিকাতেও কতকগুলি ফরাসী উপনিবেশ স্থাপিত হয়।

ভৌগলিক অভিযানের ফল ঃ আমরা উপরে যাহা বলিয়াছি তাহা হইতেই বুঝা যাইবে, রেনসাঁস যুগে অজানা পথ অনুসন্ধানের ফল কতখানি ব্যাপক হইয়াছিল। এই অনুসন্ধানের ফলে এশিয়ার সহিত ইউরোপের সংযোগ স্থাপিত হয়, আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়। অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও আরও অগণিত স্থানের আবিষ্কার সম্ভব হয়। এই সব আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীর সম্বন্ধে মানুষের ধারণার আমূল পরিবর্তন হয়। ভারত মহাসাগর, আটলাণ্টিক মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগর বাণিজ্যের রাজপথে পরিণত হয়। ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্যিক গুরুত্ব কমিয়া যাওয়ায় ইটালীর নগর রাষ্ট্রগুলির শক্তি ও সম্পদ ক্রমেই কমিতে থাকে। নূতন বাণিজ্য পথের নিয়ন্ত্রণ লাভ

করিয়া পর্তুগাল, স্পেন, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড প্রভৃতি রাজ্য ঐশ্বর্য ও পরাক্রমে পূর্ণ হইয়া উঠে। ইহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। ইউরোপীয়েরা বিদেশে বাণিজ্য বিস্তার করিয়াই তৃপ্ত হয় নাই, তাহারা বহুস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে। তাহারা যে স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে নাই, সেই সব স্থানেও তাহাদের গমনাগমনের ফলে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভাব ছড়াইয়া পড়ে। এইরূপে ইউরোপীয় সভ্যতা বর্তমান বিশ্বসভ্যতার সর্বপ্রধান উপাদান হইয়া উঠে।

কালপঞ্জী

খৃঃ ১৪৯২ কলম্বাসের আমেরিকার উপকূল আবিষ্কার
খৃঃ ১৪৯৮ ভাস্কো-ডা-গামার কালিকটে আগমন
খৃঃ ১৫১৯ ম্যাজেল্যানের অভিযানের আরম্ভ
খৃঃ ১৬০০ ইংরেজের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠা
খৃঃ ১৬০২ ওলন্দাজদের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠা
খৃঃ ১৬৬৫ ফরাসীদের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠা

অনুশীলনী

১। কি কারণে মধ্যযুগে ইউরোপীয়দের কর্মধারা ইউরোপের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল?

২। ইউরোপীয়েরা কি উদ্দেশ্যে ভৌগোলিক অভিযান আরম্ভ করে?

৩। কি ভাবে ইউরোপীয়েরা ভৌগোলিক অভিযান সফল করিবার ব্যবস্থা করে?

৪। ইউরোপীয় ভৌগোলিক অভিযানকারীদের লক্ষ্যস্থান ছিল কোন্ কোন্ দেশ?

৫। কি কারণে ইউরোপীয়েরা ভারতবর্ষে যাইবার জলপথ আবিষ্কার করিতে আগ্রহশীল হইয়াছিল?

৬। কি ভাবে ভারতবর্ষে যাইবার জলপথ আবিস্কৃত হয় ?

৭। কি ভাবে আমেরিকা আবিস্কৃত হয় ?

৮। ম্যাজেল্যান কে ? কেন তিনি স্মরণীয় হইয়াছেন ?

৯। ইউরোপীয়দের ভৌগোলিক আবিষ্ক্রিয়ার কি ফল হয় ?

১০। ভৌগোলিক আবিষ্ক্রিয়ার ফলে ইউরোপের কোন কোন দেশ উপকৃত হয় ?

১১। ভারতবর্ষে আসিবার জলপথ আবিষ্কার হওয়ার ফলে কোন্ কোন্ ইউরোপীয় জাতি এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করে ?

তৃতীয় অধ্যায়

মোগল শাসিত ভারতবর্ষ

ইউরোপে যখন রেনেসাঁস ও রিফরর্মেসন্ (ধর্মসংস্কার) আন্দোলন পূর্ণ গতিতে চলিতেছিল, তখন ভারতবর্ষ ছিল মোগলদের শাসনাধীন।

মোগল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হইলেন আকবর। আকবরের পিতামহ বাবরের শিরায় ছিল মধ্যযুগের দুইজন দিগ্‌বিজয়ীর শোণিতধারা। পিতার দিক দিয়া তিনি ছিলেন তৈমুরের এবং মাতার দিক দিয়া চিঙ্গিস্ খাঁর বংশধর। তাঁর জন্মের পূর্বেই কিন্তু তৈমুরের সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তিনি ফরগণা নামক একটি ছোট রাজ্য মাত্র লাভ করেন। ঐ রাজ্যটিও তাঁহার হাতছাড়া হইয়া যায়।

বাবর

রাজ্য হারাইয়াও বাবর নিরাশ হইলেন না। তিনি কাবুল এবং পরে উত্তর ভারতের কতক অংশ জয় করিয়া একটি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। উহার আয়তন খুব বড় ছিল না। বাবরের পুত্র ঐ সাম্রাজ্যটি রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি শের খাঁ নামক বিহারের শাসনকর্তার হাতে পরাজিত হইয়া এই দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যান।

শের শাহঃ শের খাঁ শেরশাহ উপাধি লইয়া হুমায়ুনের শূন্য সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং পাঁচ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। এই অল্পসময়ের মধ্যে তিনি ভারতবর্ষের এক বিশাল অংশ তাঁহার অধীনে আনয়ন করেন। সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াই তিনি তৃপ্ত হন নাই। বহু কল্যাণমূলক সংস্কার দ্বারা তিনি ঐ সাম্রাজ্যকে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিকট প্রিয় করিয়া তোলেন। তাঁহার বহু সংস্কার গ্রহণ করিয়া পরে আকবর তাঁহার সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়া তুলিতে সমর্থ হন।

শেরশাহ

শেরশাহের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই তাঁহার বংশধরদের মধ্যে গৃহবিবাদ আরম্ভ হয়। এই বিবাদের সুযোগ লইয়া হুমায়ুন এদেশে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার সাম্রাজ্যের এক ক্ষুদ্র অংশ জয় করিয়া লন। ইহার অল্পকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

আকবরঃ আকবর প্রথমেই তাঁহার ছোট রাজ্যটিকে শত্রুদের হাত হইতে নিরাপদ করেন। তারপর তিনি উহার সীমা বাড়াইতে আরম্ভ করেন। যুদ্ধ করিয়া, যুদ্ধের ভয় দেখাইয়া, কখনও বা উদার নীতির সাহায্যে শত্রুকে মিত্রে পরিণত করিয়া, তিনি হিন্দুকুশ হইতে ব্রহ্মপুত্র এবং হিমালয় হইতে খান্দেশের অন্তর্গত অসীরগড়ের মধ্যবর্তী প্রায় সকল ভূভাগের উপর আপনার শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন।

আমরা আকবরের বিষয় যাহা বলিলাম তাহা হইতেই বুঝা যাইবে তিনি সাধারণ লোক ছিলেন না। সত্য বলিতে কি তিনি ছিলেন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। সেই প্রতিভা তাঁহার চেহারায়ও ফুটিয়া থাকিত। তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকিত আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদার অনির্বাণ আলোক। কিন্তু এই আলোকে প্রখরতা ছিল না। ইহার দীপ্তি ছিল সুস্নিগ্ধ ও সুমধুর।

আকবর ছিলেন শক্তি, সাহস, উদারতা, ক্ষমাশীলতা প্রভৃতি গুণের মূর্ত প্রতীক। তিনি প্রতিরোধ সহ্য করিতেন না। কিন্তু পরাজিত শত্রুর প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না, সুস্নিগ্ধ ব্যবহারে তিনি তাহাকে মিত্র করিয়া তুলিতেন। তিনি সাম্রাজ্য গড়িয়াই তৃপ্ত হন নাই। ঐ সাম্রাজ্যকে সকলের মঙ্গলের নিদান করাই ছিল তাঁহার লক্ষ্য।

আকবর

আকবরের ঐশ্বর্য ছিল অমিত, তবুও তিনি অলস বিলাসে সময় ব্যয় করিতেন না। তিনি ছিলেন মিতাহারী, তিনি নিরামিষ খাদ্য ভালবাসিতেন। তিনি রাত্রে অল্প সময়ই নিদ্রা যাইতেন। দিনের অধিকাংশ সময়ই তিনি রাজকার্য করিতেন। অবশিষ্ট সময় তিনি ক্রীড়া-কৌতুকে, জ্ঞান আহরণে এবং ধর্মের আলোচনায় ব্যয় করিতেন।

আকবর লিখিতে ও পড়িতে জানিতেন না। কিন্তু বিদ্যার প্রতি তাঁহার অনুরাগের অন্ত ছিল না। শিল্প, সংগীত, সাহিত্য, দর্শন, প্রভৃতি সর্ব বিষয়েই তাঁহার সমান আগ্রহ ছিল। হিন্দু, মুসলমান,

পার্শী, খৃষ্টান প্রভৃতি মনীষীরা তাঁহার সভায় তুল্যরূপ সমাদৃত হইতেন।

ধর্মের প্রতিও তাঁহার অকপট নিষ্ঠা ছিল। সন্ধ্যায় তাঁহার উপাসনা গৃহে বিভিন্ন ধর্মের আলোচনা হইত। নিবিড় কৌতূহলের সহিত তিনি ঐ আলোচনায় যোগ দিতেন। কিন্তু আলোচনা শুনিয়াই তিনি তৃপ্ত হইতেন না। মাঝে মাঝে তিনি রাজধানী হইতে বহুদূরে গিয়া সাধুসন্ন্যাসীর সহিত দিনের পর দিন যাপন করিতেন।

বহু ধর্মের প্রভাব লাভ করায় তাঁহার ধর্মমত ক্রমেই উদারতর হইতে থাকে। শেষে তিনি প্রচলিত প্রধান প্রধান ধর্মের মূলনীতি লইয়া একটি নূতন ধর্ম প্রবর্তন করেন। ইহার নাম 'দীন ইলাহি'। এই ধর্মের সাহায্যে তিনি তাঁহার সাম্রাজ্যের সকল অধিবাসীকে সম্মিলিত করিয়া তাঁহাদিগকে একটি অভিন্ন জাতিতে পরিণত করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার এই প্রয়াস সফল হয় নাই, কিন্তু তাঁহার আদর্শ তাঁহার একটি বিশেষ অবদান হইয়া রহিয়াছে।

জাহাঙ্গীর ঃ আকবরের পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র জাহাঙ্গীর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং প্রায় বাইশ বৎসর কাল রাজত্ব করেন।

জাহাঙ্গীরের চেহারায় সৌন্দর্যের অভাব ছিল না। তাঁহার দেহে শক্তি ছিল, শৌর্যেরও আভাষ ছিল। মাঝে মাঝে তিনি অদ্ভুত শ্রমশীলতারও পরিচয় দিতেন। দুঃখের বিষয় অতিরিক্ত সুরাপান ও অহিফেন সেবনের ফলে তিনি তাঁহার কর্মশক্তিকে দুর্বল করিয়া ফেলেন। তিনি রাত্রে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত জাগিয়া কাটাইতেন, ফলে তাঁহাকে সকালে ও বিকালের দিকে ঘুমাইতে হইত।

তিনি প্রতিদিন ভোরে জনসাধারণকে দর্শন দিতেন এবং

নিয়মিতভাবে দরবার করিতেন। তিনি প্রতি বুধবার প্রজাদের অভিযোগ শুনিতেন এবং উহার বিচার করিতেন। তিনি একটি প্রকাণ্ড শিকলের সহিত কতকগুলি ঘণ্টা বাঁধিয়া দেন। যে কোনও প্রজা ঘণ্টা বাজাইয়া সম্রাটকে তাঁহার দুঃখের কথা জানাইতে পারিত। তবুও একথা বলিতেই হইবে যে জাহাঙ্গীর সাম্রাজ্যের গুরুভার বহন করিতে ভালবাসিতেন না। তিনি তাঁহার পত্নী নুরজাহানের হাতে ঐ ভার একরকম ছাড়িয়া দেন।

জাহাঙ্গীর

অবশ্য তাঁহার শাসনকালে মোগল সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তৃততর হইয়াছিল। ঐ সময় বঙ্গদেশে একটি বিদ্রোহ দমিত হয়। মেবারের রাণা দিল্লীর সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন। কাশ্মীরের নিকটবর্তী কাঙ্গারা দুর্গ এবং আহম্মদ নগর রাজ্যের কতকটা অংশ অধিকৃত হয়। এই সব কাজ কিন্তু জাহাঙ্গীরের উদ্যমের ফল নহে। ইহাদের গৌরব তাঁহার সেনাপতিদেরই প্রাপ্য।

রাজ্যশাসনের ন্যায় কঠোর সামরিক অভিযানেও জাহাঙ্গীরের বিশেষ আগ্রহ ছিল না। তাঁহার আগ্রহ ছিল সাহিত্য, স্থাপত্য ও চিত্রকলার অনুশীলনে। তাঁহার সৌন্দর্যবোধ ছিল গভীর ও বহুমুখী। বহু ঐতিহাসিক, কবি ও শিল্পী তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করিতেন। সম্রাট নিজেও সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়া তাঁহার নাম স্মরণীয় করিয়া

রাখিয়াছেন। তাঁহার রচিত আত্মচরিত বিশ্বসাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ। আকবরের সমাধি মন্দিরের অনুপম পরিকল্পনা তাঁহার একটি অমর কীর্তি। সংগীতেও তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। প্রকৃতির সহিত তাঁহার নিবিড় সংযোগ ছিল। ফুল ও পাখীর প্রতি তাঁহার উৎসাহ ও অনুরোগের অন্ত ছিল না।

কেহ কেহ জাহাঙ্গীরকে নাস্তিক বলিয়াছেন, কিন্তু একথা সত্য নহে। ভগবানের অস্তিত্বে তাঁহার অপকট বিশ্বাস ছিল। মালা জপ করিয়া তিনি দিনের কাজ আরম্ভ করিতেন। তিনি কোন বিশেষ ধর্মের মধ্যে আপনাকে নিবদ্ধ রাখিতেন না। তাঁহার ধর্মমত ছিল উদার। তাই তিনি ইসলাম ভিন্ন অন্য ধর্মকেও সম্মান করিতেন।

শাহ্‌জাহানঃ জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শাহ্‌জাহান পিতার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

শাহ্‌জাহান

শাহ্‌জাহানের চোখে ছিল বুদ্ধির দীপ্তি, দেহে ছিল স্বাভাবিক শক্তি। ব্যায়াম ও নানাবিধ দৈহিক ক্রীড়ার সাহায্যে তিনি এই শক্তিকে আরও বাড়াইয়া তোলেন। তীর ও বন্দুক ছুড়িতে এবং তলোয়ার চালাইতে তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। ঘোড়ায় চড়িয়া ক্রোশের পর ক্রোশ চলিয়াও তাঁহার ক্লান্তি হইত না। তাঁহার সাহস ছিল, উচ্চশা ছিল, সাংসারিক জ্ঞান ছিল, অপরের চিত্ত জয় করিবার শক্তি ছিল।

তাঁহার সামরিক জ্ঞান ছিল সুপ্রচুর। তাঁহার শাসনকালে আহ্‌মদনগরের সকল অংশ মোগল সাম্রাজ্যের অধীন হয় এবং বিজাপুর ও গোলকুণ্ডারাজ্যে মোগল প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শাহ্‌জাহানের শাসনক্ষমতাও অল্প ছিল না। তিনি অপরাধ নিবারণ করিতে এবং অপরাধীকে দণ্ড দিতে যত্নের ত্রুটি করিতেন না। তিনি অনেক সময় নির্মমতার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অন্তরে কোমলতার অভাব ছিল না।

শাহ্‌জাহান ছিলেন একান্তভাবে আড়ম্বরপ্রিয়। তাঁহার এই আড়ম্বরপ্রীতি তাঁহার পরিচ্ছদে পর্যন্ত প্রকাশিত হইত। নৃত্যগীতে তাঁহার সান্ধ্য সভা মুখরিত থাকিত। আড়ম্বরপ্রিয়তা কিন্তু তাঁহার অনুপম সৌন্দর্যবোধকে ম্লান করে নাই। এই সৌন্দর্যবোধের প্রেরণায় তিনি স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার অসামান্য উৎকর্ষ সাধন করিয়া আপনার শাসনকালকে অক্ষয় মহিমায় পূর্ণ করিয়া তোলেন।

শাহ্‌জাহানের শেষ জীবন কিন্তু সুখে কাটে নাই। তাঁহার তৃতীয় পুত্র ঔরঙ্গজীব তাঁহাকে আগ্রার দুর্গে বন্দী করিয়া রাখেন। বন্দী অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

ঔরঙ্গজীব : পিতাকে বন্দী করিয়া ঔরঙ্গজীব দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কাল মোগল সাম্রাজ্যের শাসন পরিচালনা করেন।

ঔরঙ্গজীব সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার চেহারায় তাঁহার তেজ, বীর্য এবং সুতীক্ষ্ণ ধী-শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইত। তাঁহার চরিত্রও ছিল সুনির্মল। তাঁহার জীবনে রূপ লাভ করিয়াছিল ইসলামের সুপ্রাচীন আদর্শ। প্রাচীন খলিফাদের ন্যায় তিনিও আপনাকে সুখভোগ হইতে সযত্নে দূরে রাখিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার দরবার

হইতে নৃত্যগীতি ও জ্যোতির্বিদ্যার আলোচনা বন্ধ করিয়া দেন। চারুকলার প্রতিও তাঁহার অনুরাগ ছিল না।

ঔরঙ্গজীব

ইসলামের আদর্শ অনুসরণ করিয়াই তিনি তৃপ্ত হন নাই। ঐ আদর্শকে ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রচার করাই ছিল তাঁহার জীবনের লক্ষ্য। হিন্দুরা তাঁহার আদর্শ গ্রহণ করিতে সম্মত না হওয়ায় তিনি তাঁহাদিগকে নির্যাতিত করিতেও দ্বিধা করেন নাই।

যে সকল মুসলমান তাঁহার ধর্মমত মানিতেন না, তিনি তাঁহাদিগকেও ক্ষমা করিতেন না। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানেরা ছিলেন ঐ শ্রেণীর মুসলমান। ঔরঙ্গজীব ঐ দুইটি রাজ্য জয় করিয়া লন। তাঁহার এই কাজের ফলে মোগল সাম্রাজ্যের সীমা আরও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু দুইটি মুসলমান রাজ্যের বিলোপের ফলে ঐ সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। ঔরঙ্গজীবের শত্রুরা এই দুর্বলতার সুযোগ লইতে বিলম্ব করে নাই। এই সব শত্রুদের প্রধান হইল মারাঠা, শিখ ও রাজপুত জাতি।

মারাঠা, শিখ ও রাজপুতদের অভ্যুত্থান: মারাঠারা মহারাষ্ট্র-দেশের অধিবাসী। শিবাজী নামে একজন কর্মবীর ইহাদিগকে মিলিত করেন। তারপর তিনি ঔরঙ্গজীবের সকল প্রতিকূলতা বিফল করিয়া ইহাদিগকে লইয়া একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। শিবাজীর মৃত্যুর পরেও ঔরঙ্গজীব মারাঠাগণকে দমন করিতে প্রাণপণে যত্ন করেন, কিন্তু তাহারা ক্রমেই অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং

দক্ষিণ ভারতের এক বিশাল অংশে মোগল প্রভুত্বকে বিলুপ্তপ্রায় করিয়া তোলে।

শিখেরা বাস করিত পাঞ্জাবে। তাহারা ছিল গুরু নানকের শিষ্য এবং শান্তিপ্রিয় কৃষিজীবী। ঔরঙ্গজীবের উৎপীড়নের ফলে তাহারা মোগল সাম্রাজ্যের ঘোরতর শত্রু হইয়া উঠে।

একই কারণে রাজপুতেরাও মেবারের মহারাণা রাজসিংহের নেতৃত্বে বিদ্রোহ আরম্ভ করে এবং রাজপুতনায় মোগল প্রভুত্ব বিপন্ন করিয়া তোলে।

সাম্রাজ্যের অধঃপতনঃ এইসব কারণে ঔরঙ্গজীবের রাজত্ব কালেই মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হয়। তাঁহার মৃত্যুর পরে সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া প্রাদেশিক শাসনকর্তারা আপনাদের শক্তি বাড়াইয়া তোলেন এবং শেষে কার্যতঃ স্বাধীন হইয়া উঠেন। ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর পঞ্চাশ বৎসর পরেই মোগল সাম্রাজ্যের কার্যতঃ অবসান হয়। পড়িয়া থাকে উহার অপচ্ছায়া আর আঁকড়াইয়া থাকে কয়েকজন নামে মাত্র বাদশাহ।

অধঃপতনের কারণঃ মোগল সাম্রাজ্যের এই পরিণতির কথা স্মরণ করিলে স্বতঃই মনে এই প্রশ্নের উদয়—কি কারণে এতবড় শক্তিশালী সাম্রাজ্যের পতন হইল? আমরা এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছি।

মোগল সাম্রাজ্যের শোচনীয় পরিণতি প্রধানতঃ ঔরঙ্গজীবের অবিবেচনারই ফল।

আকবর তাঁহার গভীর রাজনৈতিক প্রতিভা ও উদার ধর্মনীতির বলে মোগল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি বুঝিতেন দেশের অধিকাংশ অধিবাসীর প্রীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত না হইলে কোনও সম্রাজ্যই স্থায়ী লইতে পারে না। তাই তিনি সংখ্যাগুরু হিন্দুগণকে
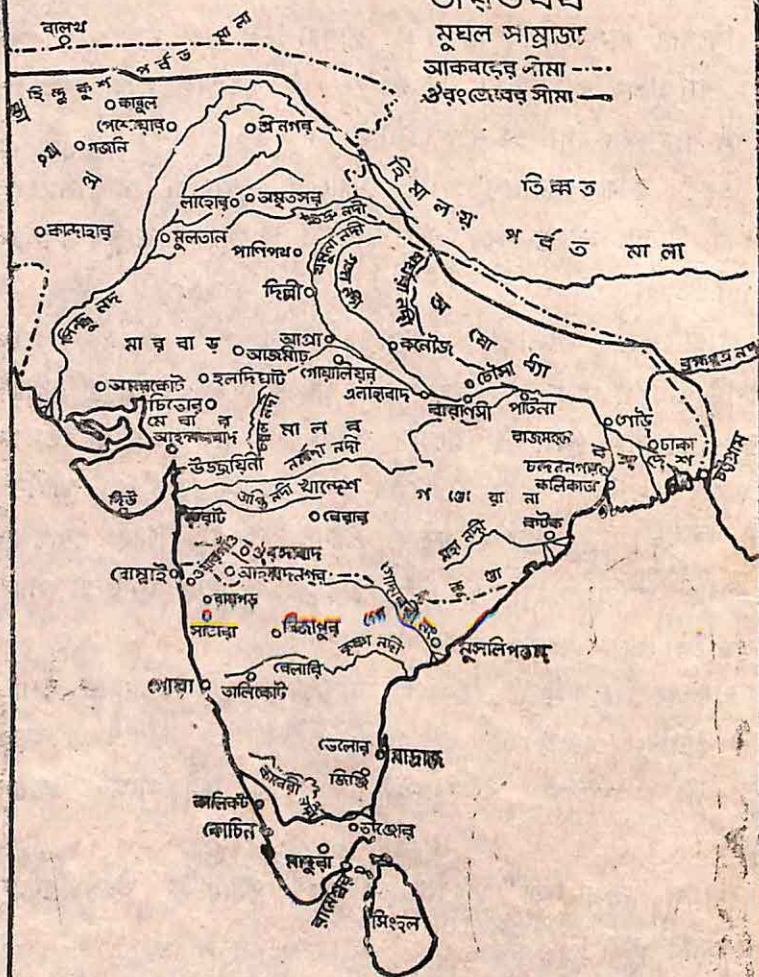
ভারতবর্ষ
মুঘল সাম্রাজ্য
আকবরের সীমা
ঔরংজেবের সীমা
বালখ
কাবুল
পেশোয়ার
গজনি
শ্রীনগর
তিব্বত
লাহোর
অমৃতসর
কান্দাহার
মুলতান
পাণিপথ
দিল্লী
আগ্রা
আজমীঢ়
কনৌজ
গোয়ালিয়র
এলাহাবাদ
বারাণসী
পাটনা
গৌড়
ঢাকা
চট্টগ্রাম
রাজমহল
চন্দননগর
কলিকাতা
হলদিঘাট
চিতোর
আহমদাবাদ
উজ্জয়িনী
নর্মদা নদী
খান্দেশ
সুরাট
বেরার
কটক
ঔরঙ্গাবাদ
বোম্বাই
আহম্মদনগর
রায়গড়
সাতারা
বিজাপুর
কৃষ্ণা নদী
মসলিপত্তম
বেলারি
গোয়া
তালিকোট
ভেলোর
মাদ্রাজ
জিঞ্জি
কালিকট
কোচিন
তাঞ্জোর
মাদুরা
সিংহল
ভারত মহাসাগর

ধর্ম উপাসনার অবাধ অধিকার ও সরকারী কাজের সুযোগ দিয়া তাহাদের চিত্ত জয় করেন। তিনি রণপ্রিয় রাজপুতদের সহিত মিত্রতা করিয়া তাহাদিগকে সাম্রাজ্যের স্তম্ভ করিয়া তোলেন। ঔরঙ্গজীব ভারতবর্ষকে ইসলামের পবিত্র ভূমি করিতে গিয়া হিন্দুদের প্রীতি হইতে এবং রাজপুতদের সামরিক সহযোগিতা হইতে তাঁহার সাম্রাজ্যকে বঞ্চিত করেন। ফলে ঐ সাম্রাজ্য একটি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। তাঁহার অন্ধ ধর্মনীতির ফলে হিন্দুদের মধ্যে নবজাগরণ আরম্ভ হয়। স্বাধীনতা লাভ ও স্বধর্ম রক্ষার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহারা বিভিন্ন দিক দিয়া ঐ সাম্রাজ্যকে আঘাত করিয়া উহাকে ক্রমেই দুর্বলতর করিয়া তোলে।

মোগলদের সামরিক শক্তিতেও ঘুণ ধরিয়াছিল। সৈন্যবাহিনীর আকার ছিল বিশাল। উহার অস্ত্রসজ্জাও ছিল বিপুল। কিন্তু সৈনিকদের মধ্যে পূর্বের শৃঙ্খলা ছিল না, কর্মশক্তি ছিল না, সাম্রাজ্য রক্ষার উৎসাহও ছিল না। তাহারা বিলাসী হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা ভাল খাদ্য চাহিত, ভাল পোশাক চাহিত, বিশ্রাম চাহিত, ধীরেসুস্থে চলিতে চাহিত। এই সব কারণে তাহারা ক্ষিপ্রগতি মারাঠা, রাজপুত, শিখ অশ্বারোহীদের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। পরাজয়ের পর পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হইত।

সাম্রাজ্যের বিশালতাও একটি জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছিল। উহার বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত সংযোগ রক্ষা করা সহজ হইত না। এক অংশে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে সহজে ঐ স্থানে সৈন্য পাঠান সম্ভব হইত না। এই সব কারণে সাম্রাজ্যের একতা রক্ষা করা কোন-দিনই সহজ ছিল না। সম্রাটদের শক্তি দুর্বল হইয়া পড়িলে ঐ একতা রক্ষা করা আরও কঠিন হইয়া উঠে।

সাম্রাজ্যের দুর্বলতার কথা জানিতে পারিয়া পারস্য সম্রাট নাদির

শাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তিনি মোগল সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়া দিল্লীতে প্রবেশ করেন। প্রথমে তিনি ঐ নগরীর অধিবাসীদের উপর কোন উপদ্রব করেন নাই। কিন্তু তাহারা নাদির শাহের মৃত্যুর গুজব শুনিয়া কয়েক শত পারসীক সৈন্যকে হত্যা করে। তখন তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রায় দেড় লক্ষ লোককে হত্যা করেন। ইহার পর তিনি প্রায় পনের কোটি নগদ টাকা, পঞ্চাশ কোটি টাকা মূল্যের মণিমাণিক্য এবং শাহ্‌জাহানের জগদ্‌বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন লইয়া দেশে ফিরিয়া যান। নাদির শাহের পরে আসেন আফগানিস্থানের সম্রাট **আহমদ শাহ আবদালী**। তিনিও দিল্লী লুণ্ঠন করিয়া অমিত ধনরত্ন লইয়া ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন। এই সব বৈদেশিক আক্রমণের ফলে মোগল সাম্রাজ্যের শিথিল ভিত্তি শিথিলতর হয় এবং উহার ধ্বংস অনিবার্য হইয়া উঠে।

মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংস হইলেও তাহার সহিত সংযুক্ত সব কিছুর ধ্বংস হইল না। উহার শাসনব্যবস্থা ও সংস্কৃতির প্রভাব পরবর্তীকালের জন্য রহিয়া গেল। এই কারণে আমরা মোগলদের শাসনব্যবস্থা ও সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি।

মোগল শাসনব্যবস্থাঃ মোগল শাসনব্যবস্থার সহিত আমাদের একেবারেই পরিচয় নাই একথা বলা চলে না। ঐ শাসনব্যবস্থার অনেকগুলি উপকরণ আমাদের শাসনব্যবস্থার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, অন্ততঃ ঐ সব উপকরণের সহিত আমাদের শাসনব্যবস্থার অনেকগুলি উপকরণের সাদৃশ্য রহিয়াছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই আমাদের এই কথা প্রমাণিত হইবে।

মোগল সাম্রাজ্য কতকগুলি সুবায় বিভক্ত ছিল। এক একটি সুবা ছিল এক একজন সিপাহশালার বা সুবাদারের অধীন।

আমাদের ভারতবর্ষ কতকগুলি রাজ্যে বা প্রদেশে বিভক্ত। এক একটি রাজ্য শাসন করেন এক একজন রাজ্যপাল।

আমাদের সময়ের ন্যায় মোগল যুগেও শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা ছিল। শহরে যিনি শান্তি রক্ষা করিতেন তাঁহাকে বলা হইত কোতোয়াল। এই কোতোয়ালের কাজের সহিত আমাদের জেলার আরক্ষাধ্যক্ষের (Superintendent of Police) কাজের মিল আছে। এই সব কাজের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল চোরের সন্ধান করা, রাত্রে পাহারার ব্যবস্থা করা, বাজারের তত্ত্বাবধান করা, ইত্যাদি। যিনি জেলার শান্তি রক্ষা করিতেন তাঁহাকে বলা হইত ফৌজদার। ফৌজদারের প্রধান কাজ ছিল ছোট ছোট বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে উহা দমন করা, ডাকাতি নিবারণ করা, ডাকাত দলকে ছত্রভঙ্গ করা, ইত্যাদি। ফৌজদারের কথা মনে হইলে আমাদের জেলার শাসনকর্তার (Magistrate) কথা মনে হয়। তিনি পুলিশ বিভাগের সাহায্যে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করেন। ফৌজদারের ন্যায় তিনি সৈন্য পরিচালনা করেন না। কিন্তু প্রয়োজন হইলে তিনি সৈন্যের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারেন।

মোগল যুগে যাহার হাতে বিচারের ভার ছিল তাহাকে বলা হইত কাজী। এই কাজীর কথা মনে হইলে আমাদের বিচারকের (Judge) কথা মনে হয়।

মোগল যুগের রাজস্ব ব্যবস্থার সহিত বর্তমান রাজস্ব ব্যবস্থারও কিছু কিছু মিল আছে। ঐ যুগেও জমির জরিপ করা হইত। জমি জরিপ করিয়া ভূমিকর নির্ধারণ করা হইত। কৃষকগণকে উৎপন্ন শস্যের একটা অংশ কর স্বরূপ দিতে হইত। তাহারা কবুলিয়ৎ, পাট্টা প্রভৃতি দলিলের সাহায্যে জমির উপরে স্বত্বের দাবি করিতে পারিত। ঐ যুগেও রাজস্ব আদায়ের জন্য বহু কর্মচারী ছিল।

ঐসব কর্মচারী যাহাতে কৃষকদের উপর উৎপীড়ন না করিতে পারে সে বিষয়েও যত্ন লওয়া হইত। ঐ যুগেও দুঃসময় উপস্থিত হইলে কখনও কখনও কর আদায় বন্ধ রাখা হইত। এমন কি কৃষকগণকে ঋণও দেওয়া হইত।

আমরা যাহা বলিলাম তাহা হইতে এরূপ যেন মনে না হয় যে, আমাদের শাসনব্যবস্থা মোগল শাসনব্যবস্থার প্রতিরূপ মাত্র। উহাদের মধ্যে বহু বিষয়ে প্রভেদ রহিয়াছে। আমরা কয়েকটির মাত্র উল্লেখ করিতেছি।

সম্রাটেরাই ছিলেন মোগলশাসনের এক রকম সর্বময় কর্তা। তাঁহাদের ইচ্ছাই ছিল আইন। জনসাধারণের প্রতিনিধিদের সহিত তাঁহাদিগকে পরামর্শ করিতে হইত না। তাঁহাদের সময় জনশাসন বলিয়া কিছু ছিল না। আমাদের সময় কিন্তু এই জনসাধারণের শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাদের প্রতিনিধিদের ইচ্ছানুসারেই আমাদের রাষ্ট্রপতি ভারতবর্ষের শাসন পরিচালনা করেন।

মোগল যুগের পদস্থ কর্মচারিগণকে বলা হইত মন্‌সবদার। ইহারা সামরিক এবং অসামরিক দুই প্রকার কাজই করিত। আমাদের শাসনব্যবস্থায় যাহারা সামরিক বিভাগে কাজ করে তাহারাই শুধু সৈন্য পরিচালনা করে। সুতরাং ঐ ব্যবস্থায় মনসবদারের স্থান নাই।

মোগল রাজপুরুষদের তুলনায় আমাদের রাজপুরুষদের অনেক বেশী কাজ করিতে হয়। ইহার প্রধান কারণ এই সব রাজপুরুষদের লক্ষ্য হইতেছে এদেশের প্রতিটি অধিবাসীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন বিকশিত করিয়া তোলা।

মোগল সম্রাটগণ তাঁহাদের প্রজাদের নৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করিতে চাহিতেন। যাহার উপর এই কাজের ভার ছিল তাহাকে বলা হইত মুতাসীর। ঐ যুগে ধর্মের সহিত নীতির সম্পর্ক ছিল অতিশয়

নিবিড়। কোনও মুসলমান ইসলাম ধর্মে আস্থাবান না হইলে তাহাকে নীতিভ্রষ্ট বলিয়া মনে করা হইত। ফলে অনেক স্বাধীন চিন্তানায়ককে নির্যাতন সহ্য করিতে হইত। আমাদের রাষ্ট্রে কাহারও উপর কোনও বিশেষ ধর্মমত চাপাইবার ব্যবস্থা নাই। কেহ কোন বিশেষ ধর্মমত না মানিলে তাহাকে নীতিহীন মনে করা হয় না। তাই আমাদের শাসনতন্ত্রে মুতাসীরের প্রয়োজন হয় না।

মোগল শাসনকর্তারা গ্রামবাসীদের ব্যাপারে একান্ত প্রয়োজন না হইলে হাত দিতেন না। গ্রামবাসীরাই সাধারণতঃ গ্রাম্যজীবন নিয়ন্ত্রিত করিত। আমাদের শাসনব্যবস্থায় গ্রামকে দেশের প্রধান অঙ্গ বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং গ্রাম-জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করা আমাদের সরকার অপরিহার্য দায়িত্ব বলিয়া মনে করেন।

মোগল যুগে জাতীয় ভাবের বিকাশ হয় নাই। তখন লোকে রাষ্ট্র রক্ষার দায়িত্বও অনুভব করিতে পারে নাই। তাই দেশে বিদ্রোহের ভয় ছিল। সুতরাং রাজপুরুষদের মধ্যে এমনভাবে ক্ষমতা ভাগ করিয়া দেওয়া হইত যাহাতে কেহই অতিরিক্ত শক্তির অধিকারী না হইতে পারে। আমাদের সময়ে কিন্তু জাতীয় ভাবের উন্মেষ হইয়াছে। লোকে রাষ্ট্র রক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছে; সুতরাং আমাদের রাজপুরুষগণকে মোগল যুগের ন্যায় পরস্পরের প্রতিযোগী করা হয় নাই।

মোগল সংস্কৃতি : মোগল শাসনব্যবস্থা অপেক্ষাও অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে মোগল সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির মধ্যে আমরা পারসিক ও ভারতীয় সংস্কৃতির সমন্বয় দেখিতে পাই। ইহার কারণ, মোগল সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল হিন্দু ও মুসলমানদের সহযোগিতার ফলে।

স্থাপত্য : মোগল যুগে স্থাপত্যের অসামান্য উন্নতি হইয়াছিল। এই যুগে বহু রমণীয় নগর, মসজিদ, সমাধিসৌধ, প্রাসাদ, দুর্গ প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছিল। আমরা সংক্ষেপে কয়েকটির কথা বলিতেছি।

ফতেপুর সিক্রী : ফতেপুর সিক্রী ছিল অনেক বৎসর ধরিয়া আকবরের রাজধানী। এই রাজধানী আকবরই নির্মাণ করেন। তিনি ইহাকে অসংখ্য পরম সুন্দর হর্ম্যে শোভিত করেন। প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসর ধরিয়া এই মহানগরী পরিত্যক্ত পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু আজিও ইহাকে এশিয়ার একটি 'বিস্ময়' বলা হইয়া থাকে।

সিকান্দারা : সিকান্দারা আগ্রার অনতিদূরে অবস্থিত। এই স্থানে আকবরের দেহ সমাহিত করা হয়। তাঁহার সমাধির উপরে একটি পরম সুন্দর সৌধ নির্মিত হয়। ইহার সহিত বৌদ্ধ-বিহারের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

জামী মসজিদ : এই অনুপম মসজিদটি নির্মাণ করেন সম্রাট শাহ্ জাহান।

আগ্রা ও দিল্লীর দুর্গ : এই দুইটি দুর্গের মধ্যে মূর্তি লাভ করিয়াছে মোগল সাম্রাজ্যের মহিমা ও মোগল সংস্কৃতির সৌন্দর্য।

তাজমহল : তাজমহল সম্রাট শাহ্ জাহানের শিল্পানুরাগের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তাঁহার পত্নী মমতাজ মহলের সমাধির উপর ইহা নির্মিত। অনেকের মতে ইহা প্রাচীন জগতের সাতটি প্রধান আশ্চর্য বস্তুর মধ্যে স্থান গ্রহণ করিবার যোগ্য।

মোগল সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রেও হিন্দু ও মুসলমানদিগের সহযোগিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ঐ যুগের চিত্রশিল্পে পারসীক ও ভারতীয় চিত্ররীতির সুস্পষ্ট আভাষ পাওয়া যায়। ঐ যুগে বিষণদাস, ভূষণ, মাধব প্রভৃতি বহু হিন্দু চিত্রকরের সন্ধান পাই।
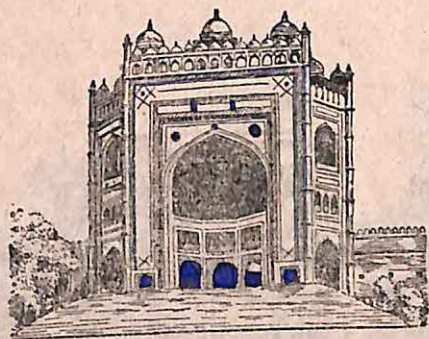
বুলান্দ দরওয়াজা (ফতেপুর সিক্রী)

দেওয়ান-ই-খাস (দিল্লী)

সিকান্দারা

আগ্রাদুর্গ
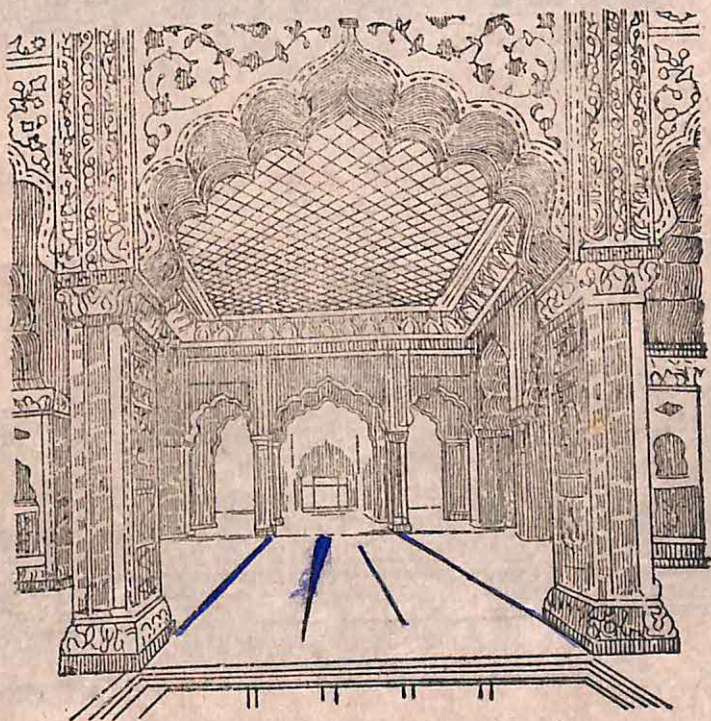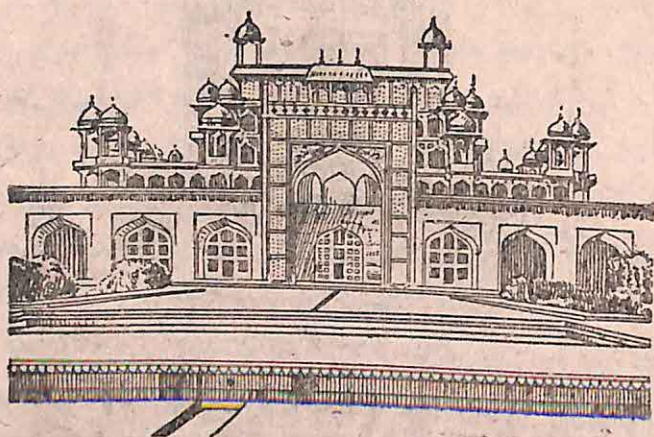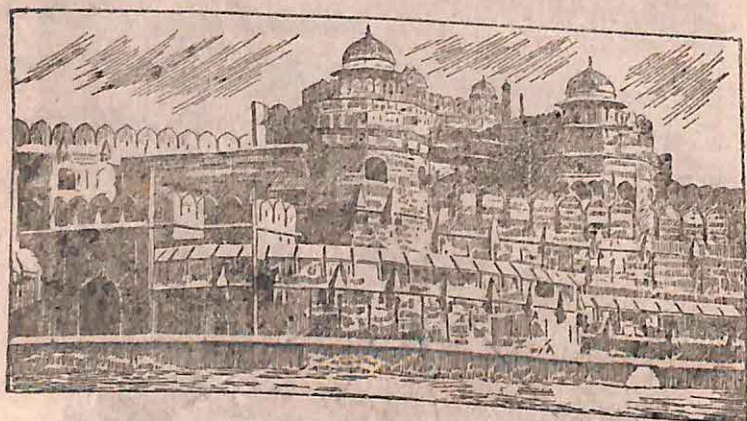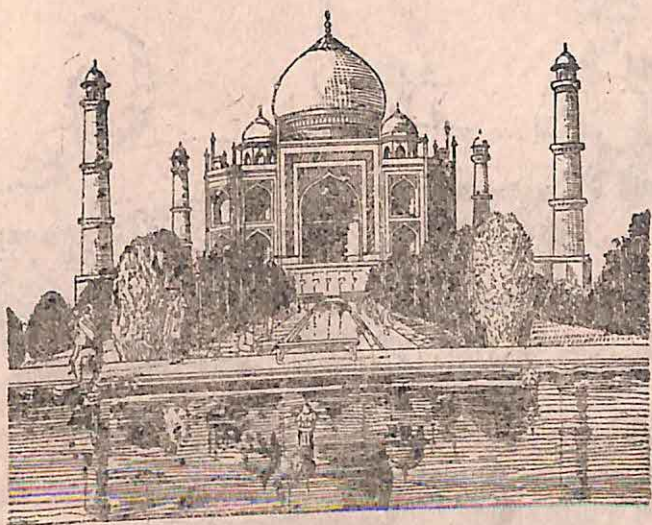
তাজমহল

জামী মসজিদ

মোগলযুগের বাদ্যযন্ত্র
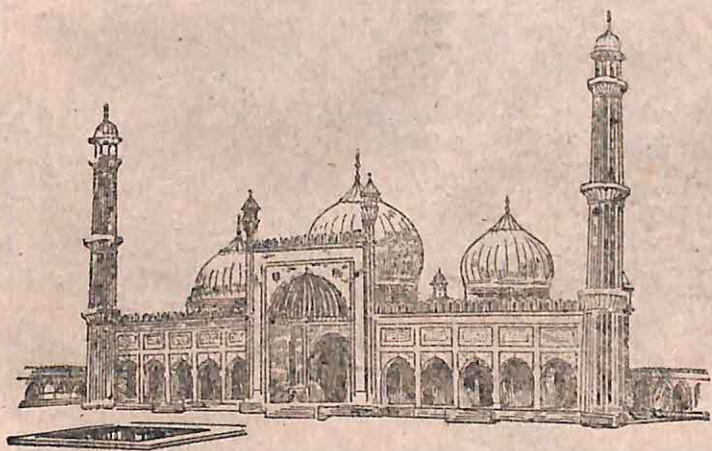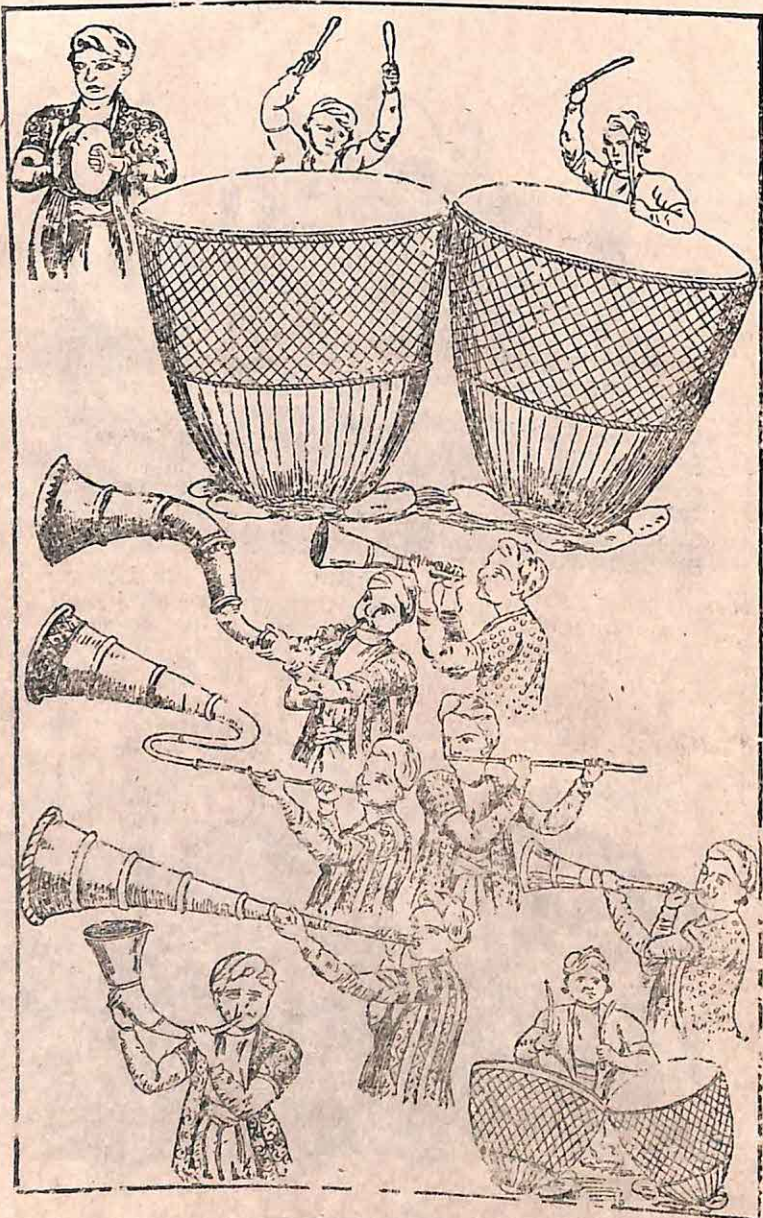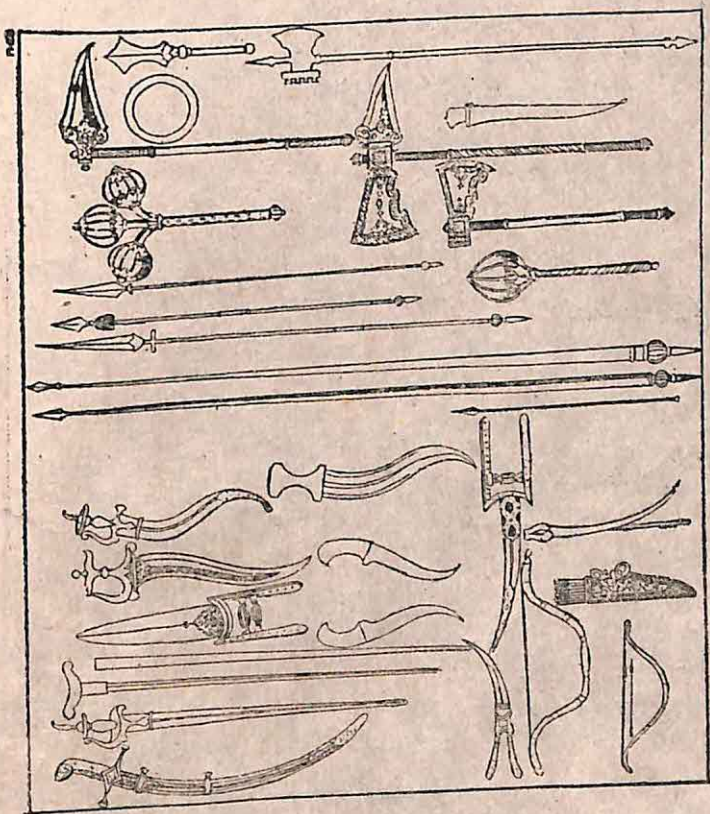
মোগলযুগের অস্ত্রশস্ত্র
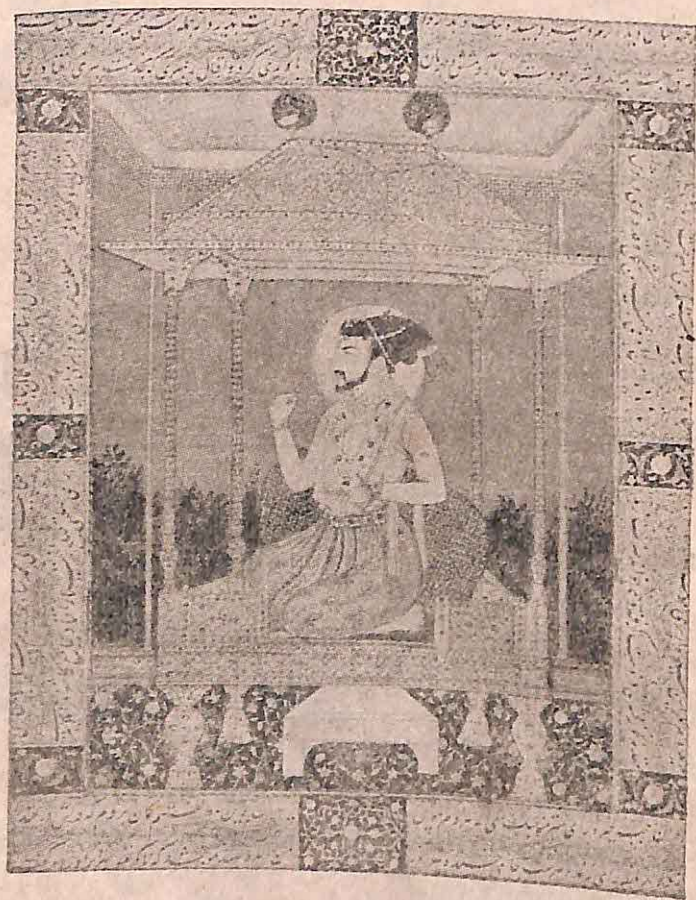
ময়ূর সিংহাসনে সমাসীন শাহ্‌জাহান

মোগল যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীতাচার্য তানসেন প্রথম জীবনে হিন্দু ছিলেন। মুসলমানদের প্রভাবেও প্রাচীন ভারতীয় সংগীত সমৃদ্ধতর হইয়া উঠে।

সাহিত্য ক্ষেত্রেও হিন্দু-মুসলমানদের সহাযাগিতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। আকবরের উৎসাহে অথর্ববেদ এবং শাহ জাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারার উদ্যমের ফলে কয়েকখানি উপনিষদ ফার্সী ভাষায় অনূদিত হয়। রায়ভারমল, সুজন রায় ক্ষত্রি, ঈশ্বরদাস নগর প্রভৃতি হিন্দু লেখকগণও ঐ ভাষায় কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। মালিক মুহম্মদ জয়সী, আব্দুর রহিম প্রভৃতি হিন্দী ভাষায়, আলাওল বঙ্গ ভাষায় এবং শেখ মহম্মদ মারাঠী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন।

ধর্ম ও সামাজিক রাজনীতিতেও আমরা অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের আভাস লক্ষ্য করি। এই অসাম্প্রদায়িকতার মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন আকবর। সুলতানী যুগের ন্যায় মোগল যুগেও সত্যপীরের প্রভাব ছিল।

ইউরোপীয় ভ্রমণকারী ও বণিকদের আগমনঃ মোগল সম্রাটদের পরাক্রম এবং তাঁহাদের সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য ও সংস্কৃতির খ্যাতি ইউরোপেও ছড়াইয়া পড়ে। তাই বহু ইউরোপীয় এদেশে আসিতে আরম্ভ করে। সার টমাস রো ইঁহাদের অন্যতম। তিনি ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের দূতরূপে জাহাঙ্গীরের সভায় আসেন। রো প্রায় চারি বৎসরেরও অধিক সময় সম্রাটের দরবারে ছিলেন। তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতা লিখিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার বিবরণ হইতে ঐ সময়কার অনেক কথা জানিতে পারা যায়। রো-র উদ্দেশ্য ছিল এদেশে ইংরাজদের বাণিজ্য করিবার পথ সুগম করিয়া দেওয়া। তাঁহার এই উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সফল হয়। জাহাঙ্গীর ইংরেজ

বণিকদিগকে কতকগুলি অধিকার দেন। ইহাতে তাহাদের বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হয়। মোগল যুগে শুধু ইংরেজ নয়, ওলন্দাজ এবং ফরাসী বণিকেরাও ভারতবর্ষে আসে। তাহারা এদেশের বিভিন্নস্থানে কুঠী স্থাপন করিয়া বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করে।
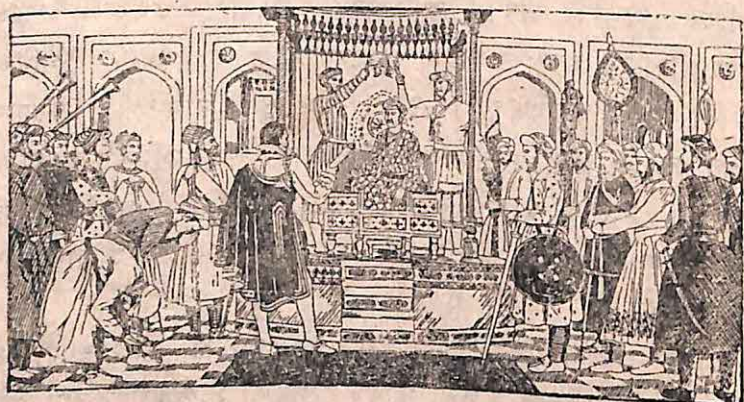
সার টমাস রোয়ের দৌত্য

এই প্রসঙ্গে আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, ইউরোপীয় বণিকদের আগমনের বহুপূর্ব হইতেই ভারতবর্ষের সহিত বিদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। মোগল যুগেও এই সম্পর্ক অব্যাহত থাকে। নূতন জলপথ আবিষ্কারের ফলে উহা আরও ব্যাপক হয়। পশ্চিম ও পূর্ব ভারতে অনেকগুলি বন্দর ছিল। ঐ সব বন্দরের মাধ্যমে বাণিজ্য চলিত। শুল্কের হার ছিল খুব কম। কিন্তু প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও উচ্চ রাজকর্মচারীরা অনেক সময় বণিকদের উপর উৎপীড়ন করিয়া বাণিজ্যের ব্যাঘাত জন্মাইত।

মোগল যুগের জীবনযাত্রা ঃ কোন দেশের পরিচয় পাইতে হইলে দেশবাসীরা কি কি বড় কাজ করিয়াছে তাহা জানাই যথেষ্ট নয়, জনসাধারণের জীবনযাত্রা কিরূপ, সে বিষয়েও ধারণা থাকা প্রয়োজন।

সে যুগের কোন লেখায় এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ চিত্র নাই। তবে বাবর ও জাহাঙ্গীরের আত্মচরিত, আকবরের মন্ত্রী আবুল ফজল রচিত আইন-ই-আকবরী, ট্যাভার্ণিয়ার, বার্ণিয়ার প্রমুখ ভ্রমণকারী বণিকদের বিবরণ এবং ইউরোপীয় বণিকদের বিভিন্ন কুঠীতে রক্ষিত দলিলপত্র এবং বাংলা, হিন্দী, মারাঠী প্রভৃতি ভাষায় লিখিত গ্রন্থ হইতে আমরা অনেক তথ্যের সন্ধান পাই।

ঐ সকল তথ্য হইতে আমরা জানিতে পারি মোগল যুগে সাম্য ছিল না, সকল শ্রেণীর লোকের সৌভাগ্য লাভের সুযোগ ছিল না।

সমাজের শীর্ষে ছিলেন সম্রাট। তাঁহার নীচে ছিল ওমরাহ্ বা সম্ভ্রান্তবংশীয় লোকেরা। ইহাদের নীচে ছিল একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণী, নিম্ন কর্মচারী, শিল্পী ও বণিকেরা ছিল এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদের নীচে ছিল দোকানদার, শ্রমিক, মজুর ও কৃষকের দল।

সম্রাট বা বাদশাহ ছিলেন এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি। তাঁহার ধনবল ও জনবলের অবধি ছিল না। তাঁহার সভা ছিল প্রায় কল্পনার অতীত। সভার মধ্যেও ছিল অপরিমিত ঐশ্বর্য ও অনুপম শিল্পশোভার অজস্র নিদর্শন। বাদশাহ বসিতেন মণিমণ্ডিত সিংহাসনে। তাঁহার পরিধানে থাকিত মণিখচিত পরিচ্ছদ। তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিতেন ওমরাহ, অমাত্য, সেনানায়ক, প্রাদেশিক শাসনকর্তা এবং দেশবিদেশ হইতে আগত রাজদূত, নট, নটী ও অগণিত গুণী ও জ্ঞানী।

ওমরাহদের জীবন ছিল ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরে পরিপূর্ণ। ক্রীড়া-কৌতুক ও প্রমোদোৎসবের মধ্য দিয়া তাঁহাদের জীবন স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হইত।

জনসাধারণের জীবনে কিন্তু অনুরূপ সৌভাগ্যের কোনরূপ লক্ষণ ছিল না। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা মিতব্যয়ী ছিল। সুতরাং

তাহাদের বড় একটা অভাব সহ্য করিতে হইত না। কিন্তু নিম্নতর শ্রেণীর লোকদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। ওমরাহেরা জিনিস কিনিয়া প্রায়ই পুরামূল্য দিতেন না। ফলে দোকানদারদের ধনী হইবার সুযোগ ছিল না। তাহারা ধনলাভ করিলেও সরকারী কর্মচারীরা নানা অজুহাতে ঐ ধন কাড়িয়া লইত। শ্রমিক ও মজুরদিগকে সারাদিন গাধার মত খাটান হইত। কিন্তু তাহাদিগকে যে মজুরি দেওয়া হইত, তাহাতে তাহারা ভাল করিয়া খাইতে পাইত না। রাজস্ব আদায়ের কর্মচারী এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের অত্যাচারে কৃষকদের জীবন দুর্বহ হইয়া উঠিয়াছিল। জিনিসপত্রের দাম ছিল অত্যন্ত অল্প, সুতরাং আয়ের সম্ভাবনা ছিল অল্প।

এই প্রসঙ্গে আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, পৃথিবীর প্রায় সব জায়গায়ই সমাজের উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে অনুরূপ বৈষম্য ছিল। সুখসৌভাগ্য, আশা ও আনন্দের মধ্যে ধনীরা বাস করিত, আর দুঃখ দৈন্য অত্যাচার সহ্য করিয়া কৃষক ও মজুরেরা কোনক্রমে দিন কাটাইত।

কালপঞ্জী

খৃঃ ১৫৫৬—১৬০৫	আকবরের শাসনকাল
খৃঃ ১৬০৫—২৭	জাহাঙ্গীরের শাসনকাল
খৃঃ ১৬২৭—৫৮	শাহ্‌জাহানের শাসনকাল
খৃঃ ১৬৫৮—১৭০৭	ঔরংজীবের শাসনকাল
খৃঃ ১৬৭৪	স্বাধীন মারাঠা রাজ্য প্রতিষ্ঠা
খৃঃ ১৭৩৯	নাদিরশাহের ভারত অভিযান
খৃঃ ১৬১৫—১৯	সার টমাস রোর ভারতে অবস্থিতি

অনুশীলনী

১। আকবর যে নূতন ধর্মের প্রবর্তন করেন তাহার নাম কি? কি উদ্দেশ্যে তিনি ঐ ধর্মের প্রবর্তন করেন?

২। জাহাঙ্গীরের ধর্মমত ও সৌন্দর্যবোধের পরিচয় দাও।

৩। ঔরঙ্গজীবের লক্ষ্য কি ছিল। এ লক্ষ্যের ফল কি হয়?

৪। মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের কারণ বিশ্লেষণ কর।

৫। ঔরঙ্গজীবের নীতির সহিত আকবরের নীতির তুলনা কর এবং মোগল সাম্রাজ্যের উপরে এই দুই নীতির প্রভাব বর্ণনা কর।

৬। মোগল শাসনব্যবস্থার সহিত আমাদের শাসনব্যবস্থার কোন্ কোন্ বিষয়ে সাদৃশ্য রহিয়াছে?

৭। মোগল শাসনব্যবস্থার সহিত আমাদের শাসনব্যবস্থার কোন্ কোন্ বিষয়ে প্রভেদ রহিয়াছে?

৮। মোগল সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৯। মোগলযুগে ভারতবর্ষে বৈদেশিক বাণিজ্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

১০। মোগলযুগে অভিজাতদের জীবনের সহিত নিম্নশ্রেণীর লোকের জীবনের তুলনা কর।
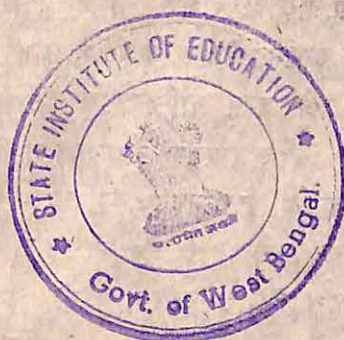
চতুর্থ অধ্যায়

ইংলণ্ডে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের রাষ্ট্রবিপ্লব

ইংলণ্ড কিরূপে বিদেশে উপনিবেশ বিস্তার করে, আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেই কথা বলিয়াছি। এই অধ্যায়ে কিরূপে ঐ দেশে স্বেচ্ছাচারী রাজশাসনের পরিবর্তে পার্লামেণ্টের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই কথা বলিতেছি। এই পরিবর্তন সম্ভব হইয়াছিল রাষ্ট্র-বিপ্লবের ফলে। এই বিপ্লব হয় খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকে স্টুয়ার্ট বংশীয় নরপতি দ্বিতীয় জেমসের শাসনকালে। কোন ঘটনাই অকারণে ঘটে না। এই বিপ্লবের পিছনেও অনেকগুলি কারণ ছিল।

বিপ্লবের পটভূমিকা : স্টুয়ার্ট বংশীয় নরপতিদের পূর্বে টিউডর বংশীয় রাজারা ইংলণ্ড শাসন করিতেন। ইঁহাদের শাসনকালে ঐ দেশে জ্ঞানের উন্নতি, ধর্মের সংস্কার এবং সাহিত্যের বিকাশ সাধিত হয়। ঐ সময় বাণিজ্যেরও বিশেষ প্রসার হয়। টিউডর বংশীয় রানী এলিজাবেথের রাজত্বকালে ইংরেজ নাবিকেরা আটলান্টিক মহাসমুদ্রে স্পেনের একাধিকার দাবী চূর্ণ করিয়া আমেরিকায় বাণিজ্য করিবার ও উপনিবেশ স্থাপন করিবার পথ খুলিয়া দেয়। এইরূপে ইংলণ্ড জ্ঞানে, ধর্মে, ধনে, মানে ইউরোপের মধ্যে ক্রমেই বড় হইয়া উঠিতে থাকে। এতদিন ধরিয়া সম্ভ্রান্তবংশীয় লোকদের সমাজে সর্বময় প্রভাব ছিল। কিন্তু এখন মধ্যবিত্ত নামে একটি নূতন শ্রেণীর আবির্ভাব হইল। ব্যবসায়ী, বণিক ও ছোট ছোট জমিদার লইয়া এই শ্রেণী গঠিত হইল এবং ক্রমে ইহার প্রভাব বাড়িতে লাগিল। ফলে, এই শ্রেণীর লোকেরা রাজনৈতিক অধিকারের জন্য অধীর হইয়া উঠিল।

ইংলণ্ডে একটি জনসভা ছিল, ইহার নাম পার্লামেণ্ট। এতদিন পর্যন্ত বড় বড় পরিবারের লোকেরাই এই পার্লামেণ্টের সদস্য হইত। সাধারণতঃ তাহারা রাজার কথায়ই চলিত। সুতরাং রাজার ইচ্ছানুসারেই দেশ শাসিত হইত। টিউডর যুগের শেষের দিক্ হইতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা পার্লামেণ্টে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। স্টুয়ার্ট যুগে তাহারা ঐ সভায় বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠে। তাহারা দাবী করে, তাহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজাকে রাজ্য শাসন করিতে হইবে। কিন্তু স্টুয়ার্ট বংশীয় নরপতিগণ এই দাবী মানিতে কোনক্রমেই রাজী হইলেন না। ফলে, রাজা ও পার্লামেণ্টের মধ্যে বিরোধ সুনিশ্চিত হইয়া উঠিল।

স্টুয়ার্ট নরপতিদের দায়িত্ব ঃ স্টুয়ার্ট নরপতিদের বুদ্ধির দোষে ঐ বিরোধ সুনিশ্চিততর হইল। তাঁহারা জাতিতে ইংরাজ ছিলেন না। স্টুয়ার্ট বংশের প্রতিষ্ঠাতা **প্রথম জেমস্** ছিলেন এলিজাবেথের প্রতিদ্বন্দ্বী মেরী স্টুয়ার্টের পুত্র। তিনি স্কটল্যাণ্ডে রাজত্ব করিতেন। এলিজাবেথের মৃত্যুর পর তিনি ইংলণ্ডের সিংহাসন লাভ করেন। সুতরাং স্টুয়ার্ট বংশীয় রাজাদের মনে রাখা উচিত ছিল যে, তাঁহারা বিদেশী। ইংলণ্ডের অধিবাসিগণের মন জয় করিবার জন্য তাঁহাদের বিশেষ যত্নশীল হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাঁহারা ঐরূপ করেন নাই। ইংরেজদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাঁহাদের সহানুভূতিও ছিল না। এই সহানুভূতির অভাব প্রকাশ করিতে তাঁহারা দ্বিধা করিতেন না। তাঁহাদের এই অবিবেচনার ফলে ইংরেজরা ক্রমেই তাঁহাদের প্রতি বিমুখ হইয়া উঠে। তাঁহাদের রাজনৈতিক আদর্শের ফলে বিরোধ আরও তীব্র হয়।

টিউডর রাজারা রাজশক্তি সুদৃঢ় করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা এই শক্তির সাহায্যে স্বদেশকে বৈদেশিক বিপদ হইতে মুক্ত

করেন এবং উহাকে শান্তি, শৃঙ্খলা ও সংস্কৃতির আধার করিয়া তোলেন। তাঁহাদের সুশাসনের ফলে ইংলণ্ডে স্বেচ্ছাচারী রাজ্য-শাসনের প্রয়োজন শেষ হইয়া যায়। কিন্তু স্টুয়ার্ট নরপতিগণ এই সত্য অনুভব করিতে পারেন নাই। প্রথম জেমস্ আপনাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি দাবী করেন, তাঁহার ইচ্ছার প্রতিকূলতা করা ঈশ্বরের প্রতিকূলতা করারই সমান। পার্লামেণ্ট কোনক্রমেই এই দাবী মানিতে চাহিল না। ইহার সভ্যরা বলিল রাজা তাহাদেরই প্রতিনিধি, সুতরাং তাহাদের ইচ্ছানুসারে চলিতে বাধ্য।

১ম জেমস্

স্বেচ্ছাচারী শাসনের আদর্শ ঘোষণা করিয়াই জেমস্ তৃপ্ত হইলেন না, তিনি ঐ আদর্শ অনুসারে রাজ্য শাসন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি পার্লামেণ্টের অনুমতি না লইয়াই শুল্ক আদায় করিতে লাগিলেন। যাহারা তাঁহার এই সব কাজের প্রতিবাদ করিল, তিনি নির্বিচারে তাহাদিগকে শাস্তি দিতে দ্বিধা করিলেন না।

ধর্ম বিষয়েও প্রথম জেমস্ পার্লামেণ্টের প্রিয় হইতে পারেন নাই। তিনি ছিলেন মধ্যপন্থী প্রোটেস্ট্যাণ্ট। অনেকে সন্দেহ করিত ক্যাথলিক ধর্মমতের সহিত তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি ছিল। পার্লামেণ্টের অধিকাংশ সভ্য ছিল চরমপন্থী প্রোটেস্ট্যাণ্ট (পিউরিট্যান)। এই সময় জার্মানীতে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ

চলিতেছিল। প্রথম জেমসের ইচ্ছা ছিল, তিনি উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপন করেন। কিন্তু পার্লামেন্ট দাবী করে যে তিনি প্রোটেস্ট্যান্টদের অনুকূলে তাঁহার সকল শক্তি নিয়োগ করিবেন। জেমস্ পার্লামেন্টের এই দাবী মানিলেন না।

প্রথম জেমসের পুত্র **প্রথম চার্লস্** পিতার মতই ছিলেন স্বেচ্ছাচারী। তিনি বিনা বিচারে লোককে আটক রাখিতেন। জনসাধারণকে তাঁহাকে ঋণ দিতে বাধ্য করিতেন। পার্লামেন্টের অনুমতি না লইয়া তিনি কতকগুলি পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক বসাইলেন। যাহারা তাঁহার কাজের প্রতিবাদ করিত তিনি তাহাদের বাড়িতে সৈন্য ও নাবিক রাখিতেন। পার্লামেন্ট এইসব কাজের প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার নিকট একটি আবেদনপত্র পাঠাইল। এই পত্রের নাম **'পিটিসন অব্ রাইট'** বা অধিকারের আবেদন। এই আবেদনপত্রে চার্লসের উল্লিখিত কাজগুলিকে বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করার দাবী করা হইল। চার্লস্ পার্লামেন্টের দাবী উপেক্ষা করিতে সাহস করিলেন না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। কিন্তু ইহাতেও পার্লামেন্টের সহিত তাঁহার বিরোধ মিটিল না। অল্পকালের মধ্যেই এই বিরোধ প্রবল হইয়া উঠিল। তখন চার্লস্ পার্লামেন্ট ভাঙ্গিয়া দিলেন।

১ম চার্লস্

প্রায় দশ বৎসর ধরিয়া তিনি পার্লামেন্ট ডাকিলেন না, নিজের ইচ্ছানুসারে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরে অবস্থার

চাপে পড়িয়া তাঁহাকে আবার পার্লামেণ্ট ডাকিতে হইল। প্রায় কুড়ি বৎসর ধরিয়া এই পার্লামেণ্ট চলিল, সুতরাং ইতিহাসে ইহা দীর্ঘস্থায়ী বা **'লং পার্লামেণ্ট'** বলিয়া পরিচিত।

পার্লামেণ্ট ভবন

সশস্ত্র গৃহযুদ্ধ: চার্লসের আশা ছিল, লং পার্লামেণ্ট তাঁহার প্রতি অনুকূল হইবে, কিন্তু তাঁহার এই আশা পূর্ণ হইল না। ঐ পার্লামেণ্ট তাঁহার স্বেচ্ছাচারের সকল সম্ভাবনা দূর করিতে প্রবৃত্ত হইল। ফলে রাজা ও পার্লামেণ্টের মধ্যে বিরোধ প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে লাগিল। শেষে দুই পক্ষ অস্ত্রের সাহায্য লইতে দ্বিধা করিল না। যুদ্ধে পার্লামেণ্টের জয় হইল। যিনি এই জয় সম্ভব করিয়া তুলিলেন তাঁহার নাম 'অলিভার ক্রমওয়েল'।

অলিভার ক্রমওয়েল

ক্রমওয়েল: ক্রমওয়েল, ছিলেন বহুগুণের অধিকারী। তাঁহার দেহে ছিল অটুট স্বাস্থ্য, মনে ছিল অমিত শক্তি। ভয় তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না,

ক্লেশ তাঁহাকে ক্লান্ত করিতে পারিত না। তিনি সহসা কোন সংকল্প করিতেন না, কিন্তু একবার সংকল্প করিলে তিনি কোনক্রমেই উহা হইতে বিচলিত হইতেন না। ক্রমওয়েলের কর্মশক্তি ছিল অসাধারণ। তিনি ছিলেন একাধারে সুনিপুণ সেনানায়ক ও সুচতুর শাসনকর্তা।

তিনি সৈন্যগণের মধ্যে শৃঙ্খলা ও উৎসাহের সঞ্চার করিয়া তাহাদের অজেয় করিয়া তুলিতে পারিতেন, আবার সুশাসন গুণে দেশ শান্তি ও সমৃদ্ধিতে পূর্ণ করিতে জানিতেন। ধর্মের প্রতিও তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি আপনাকে প্রচার করিতেন না। তিনি বলিতেন, তাঁহার কাজে ভগবানের ইচ্ছাই প্রকাশিত হইয়াছে। ভগবানের উপর তাঁহার আস্থার অবধি ছিল না। তবুও তিনি কোনও কাজ অপূর্ণ রাখিতেন না। সৈন্যগণের প্রতি তাঁহার উপদেশ ছিল—"ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখিও, কিন্তু বারুদ ভিজিতে দিও না।" এইরূপে ক্রমওয়েল ধর্ম ও কর্মের সমন্বয় সাধন করেন। অনেকে তাঁহাকে ধর্মান্ধ বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু ক্রমওয়েল ধর্মান্ধ ছিলেন না, তিনি গোঁড়া প্রোটেস্ট্যাণ্ট ছিলেন।

কিন্তু অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি তিনি যে উদারতা দেখাইয়াছেন তাহা সে যুগে অল্প লোকেই দেখাইতে পারিয়াছে। ক্রমওয়েল অনেকগুলি অবাঞ্ছিত উৎসব বন্ধ করিয়া দেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি আনন্দের মূল্য বুঝিতেন না, এ কথা মনে করিলে ভুল হইবে। তিনি গান ভালবাসিতেন, তিনি কবিতা লিখিতেও জানিতেন। একবার পার্লামেণ্ট প্রস্তাব করেন, রাজার ছবিগুলি বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইবে। ক্রমওয়েল এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং অনেকগুলি ছবি ধ্বংস হইতে রক্ষা করেন।

চার্লসের প্রাণদণ্ড ও ক্রমওয়েলের শাসন: আমরা পূর্বেই বলিয়াছি ক্রমওয়েলের সাহায্যে পার্লামেণ্ট রাজপক্ষকে পরাজিত

করিতে সমর্থ হয়। পরাজয়ের পর রাজা সৈন্যদের হাতে বন্দী হন। বিশ্বাসঘাতকতা ও দেশদ্রোহিতার অভিযোগে তাঁহার বিচার হয় এবং তাঁহার প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়। বিচারের সময় চার্লস্ নিজপক্ষ সমর্থন করেন নাই। অবিচলিত প্রশান্তির সহিত তিনি মৃত্যু বরণ করেন। তাঁহার এইরূপ আচরণের ফলে বহু লোক তাঁহার দোষ ভুলিয়া যায়। অনেকে তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়াও মনে করিতে আরম্ভ করে।

চার্লসের মৃত্যুর পর প্রায় দশ বৎসর পর্যন্ত ক্রমওয়েল ইংলণ্ডের শাসন পরিচালনা করেন। ঐ সময় তিনি দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন, বিদেশে স্বদেশের বাণিজ্য বিস্তৃত করেন, আয়র্লণ্ড ও স্কটলণ্ডকে ইংলণ্ডের সহিত যুক্ত করেন, ভূমধ্যসাগরে স্বদেশের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করেন, স্পেনের গর্ব খর্ব করেন এবং ইউরোপের প্রোটেস্ট্যাণ্ট রাষ্ট্রগুলির সহিত মিত্রতা করিয়া উহাদিগকে শক্তিশালী করেন। ক্রমওয়েল কিন্তু পার্লামেণ্টের সহিত একযোগে কাজ করিতে পারেন নাই। তিনি সৈন্যদের সাহায্যে শাসন পরিচালনা করেন। সুতরা বহু কৃতিত্ব সত্ত্বেও তাঁহার শাসন লোকপ্রিয় হয় নাই।

স্টুয়ার্ট বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা : ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর ইংলণ্ডে আবার বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হয়। ফলে, বহুলোক রাজতন্ত্রের অনুকূল হইয়া উঠে। ইহারা প্রথম চার্লসের পুত্র দ্বিতীয় চার্লস্‌কে ইংলণ্ডে ফিরাইয়া আনে। এইরূপে ইংলণ্ডে স্টুয়ার্টদের শাসন আবার প্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় চার্লস্

সিংহাসন লাভ করিবার পূর্বে দ্বিতীয় চার্লসকে বহুদিন নির্বাসনে

থাকিতে হইয়াছিল। তিনি জানিতেন পার্লামেণ্টের অপ্রিয় হইলে আবার নির্বাসনে যাইতে হইতে পারে। সুতরাং তিনি প্রকাশ্যে পার্লামেণ্টের ইচ্ছা অমান্য করিতেন না।

দ্বিতীয় জেম্‌স্‌ ও গৌরবময় বিপ্লব: দ্বিতীয় চার্লসের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা দ্বিতীয় জেম্‌স্‌ ইংলণ্ডের সিংহাসন লাভ করেন। জেমস্‌ ছিলেন অত্যন্ত দাম্ভিক। তিনি সুবুদ্ধির ধার ধারিতেন না। ফলে, পার্লামেণ্টের সহিত তাঁহার বিরোধ আরম্ভ হয়। ইহার উপর, তিনি আবার ছিলেন ক্যাথলিক। তাঁহার আচরণের ফলে লোকের ধারণা হইল, তিনি ক্যাথলিক ধর্মকে ইংলণ্ডে ফিরাইয়া আনিতে কোন রূপ যত্নের ত্রুটি করিবেন না। প্রথম জেমস্‌ ও প্রথম চার্লসের ন্যায় তিনিও আপনাকে ভগবানের প্রতিনিধি বলিয়া মনে করিতেন। তিনি দেশবাসীর রাজনৈতিক অধিকার স্বীকার করিতেন না। তাঁহার ক্যাথলিক প্রীতি ও স্বেচ্ছাচারের ফলে দেশের অধিকাংশ লোকই তাঁহার বিরোধী হইয়া উঠিল। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে তাহারা তাঁহার প্রোটেস্ট্যাণ্ট কন্যা মেরী ও তাঁহার স্বামী অরেঞ্জ বংশীয় উইলিয়মকে ইংলণ্ডে আসিয়া জেমসের স্বেচ্ছাচারের অবসান করিতে আমন্ত্রণ করিলেন।

২য় জেমস্‌

উইলিয়ম

উইলিয়ম ছিলেন হল্যাণ্ডের রাষ্ট্রনায়ক। তিনি এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন এবং সসৈন্যে ইংলণ্ডে আসিয়া পৌঁছাইলেন। সর্বশ্রেণীর ইংরেজ তাঁহাকে অভিনন্দিত করিল। জেমসের সৈন্যবাহিনীও তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করিল। সুতরাং বাধ্য হইয়া তিনি ফ্রান্সে পলাইয়া গেলেন।

ইহার অল্পপরে একটি পার্লামেণ্টের অধিবেশন হইল। ঐ পার্লামেণ্টে উইলিয়ম ও মেরীকে ইংলণ্ডের রাজা ও রানী বলিয়া ঘোষণা করা হইল।

Bill of Rights বা অধিকারের খসড়া নামক একটি প্রস্তাবাবলীকে আইনে পরিণত করা হইল। ঐ আইনের সাহায্যে স্বেচ্ছাচারী রাজশাসকের অবসান করা হইল। রাজা প্রতিশ্রুতি দিলেন, তিনি গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে পার্লামেণ্টের শাসন মানিয়া চলিবেন, তিনি জনসাধারণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা উপেক্ষা করিবেন না। এতদিন ধরিয়া ইংলণ্ডে রাজা ও পার্লামেণ্টের মধ্যে যে বিরোধ চলিতেছিল এইরূপে তাহার অবসান হইল।

এই সকল ঘটনাকে বলা হয় গৌরবময় বিপ্লব। ঘটনাগুলির ফলে ইংলণ্ডে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসিয়াছিল। সুতরাং উহাদিগকে বিপ্লব বলিলে অন্যায় হয় না। ঐ বিপ্লবে ইংলণ্ডের সকল শ্রেণীর লোক যোগ দিয়াছিল। রক্তপাতের সাহায্য ছাড়াই উহা সফল হইয়াছিল। অতএব ঐ বিপ্লব গৌরবময় বিপ্লব বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্য।

ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়িলে জানা যায় ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী কালের রাজারা সাধারণতঃ বিল অব রাইটস্ প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। তাঁহারা সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন, কিন্তু দেশের শাসন পরিচালনা করে পার্লামেণ্ট।

কালপঞ্জী

খৃঃ ১৫৫৮—১৬০৩ এলিজাবেথের শাসনকাল
খৃঃ ১৬০৩—২৫ প্রথম জেমসের শাসনকাল
খৃঃ ১৬২৮ অধিকারের আবেদন
খৃঃ ১৬২৫—৫৯ প্রথম চার্লসের শাসনকাল
খৃঃ ১৬৪২ প্রথম চার্লস ও পার্লামেণ্টের মধ্যে যুদ্ধারম্ভ
খৃঃ ১৬৪৯—৫৮ ক্রমওয়েলের শাসনকাল
খৃঃ ১৬৬০—৮৫ দ্বিতীয় চার্লসের শাসনকাল
খৃঃ ১৬৮৫—৮৮ দ্বিতীয় জেমসের শাসনকাল
খৃঃ ১৬৮৮ গৌরবময় বিপ্লব

অনুশীলনী

১। ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে যে গৃহযুদ্ধ হইয়াছিল তাহার কারণগুলি বিশ্লেষণ কর।

২। ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে যে গৃহযুদ্ধ হয়, তাহার জন্য প্রথম জেমস্ কতটুকু দায়ী?

৩। কি কি কারণে প্রথম চার্লস-এর সহিত পার্লামেণ্টের বিরোধ হয়? ঐ বিরোধের ফলই বা কি হয়?

৪। ক্রমওয়েলের চরিত্র ও কৃতিত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৫। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে কি কি কারণে ইংলণ্ডে রাষ্ট্র-বিপ্লব হইয়াছিল?

৬। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে যে বিপ্লব হয়, কি কারণে তাহাকে 'গৌরবময় বিপ্লব' বলা হইয়া থাকে?

———

পঞ্চম অধ্যায়

ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

আমরা মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কথা বলিয়াছি। ঐ পতনের সূচনা হয় ঔরংজীবের মৃত্যুর অল্প পরেই। মারাঠা, শিখ, রাজপুত প্রভৃতি জাতির প্রতিকূলতা এবং হায়দরাবাদ, অযোধ্যা ও বঙ্গদেশের শাসনকর্তাদের কার্যতঃ স্বাধীনতা ঘোষণার ফলে সাম্রাজ্যের শক্তি ও সীমা ক্রমেই সংকীর্ণ হইতে থাকে। মোগল সম্রাটেরা যোগ্যতার কোন পরিচয় না দিয়া তাঁহাদের মন্ত্রীদের হাতের পুতুলে পরিণত হন। তাঁহাদের প্রভুত্ব দিল্লী ও উহার সন্নিহিত অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়। নাদির শাহ, আহম্মদ শাহ প্রভৃতির আক্রমণের ফলে ঐ প্রভুত্ব আরও দুর্বল হয়।

ফরাসী ও ইংরেজদের রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা: সাম্রাজ্যের অধঃপতনের ফলে দেশ অরাজকতা ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তায় পূর্ণ হইয়া উঠে। স্থানীয় শাসনকর্তারা পরস্পরের সহিত কলহ করিয়া আপনাদের শক্তিক্ষয় করেন। ইচ্ছামত জনসাধারণকে উৎপীড়ন করিয়া তাঁহারা আপনাদিগকে সকলের অপ্রিয় করিয়া তোলেন। এই বিশৃঙ্খলার ফলে ফরাসী ও ইংরেজ বণিকেরা এদেশে রাজ্য বিস্তারের সুযোগ লাভ করেন। এ বিষয়ে প্রথম অগ্রণী ছিলেন পন্দিচেরীর শাসনকর্তা ডুপ্লে। তাঁহার অভিপ্রায় ছিল ভারতীয় রাজাদের গৃহ বিবাদে যোগ দিয়া ফরাসী কোম্পানীর প্রভাব ক্রমেই বাড়াইয়া তোলা এবং শেষে উহাকে রাজশক্তিতে পরিণত করা। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অভিপ্রায় সফল করিবার সুযোগ আসিল। ঐ বৎসর হায়দরাবাদের নিজামের মৃত্যু হইল। তাঁহার শূন্য সিংহাসন লইয়া পুত্র নাসিরজঙ্গ ও দৌহিত্র মুজাফ্‌ফরজঙ্গের মধ্যে বিরোধ আরম্ভ হইল। ঐ সময়ে চাঁদসাহেব নামে একব্যক্তি কর্ণাটকের নবাবকে নিহত করিয়া তাঁহার সিংহাসন লাভ করিবার উদ্যোগ

করিলেন। ডুপ্লে মুজাফ্ফরজঙ্গ ও চাঁদসাহেবের পক্ষ গ্রহণ করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় ছিল এই দুইজন তাঁবেদারকে হায়দরাবাদ ও কর্ণাটকের সিংহাসনে বসাইয়া দুই স্থানেই ফরাসী প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু ফরাসী প্রভাব বৃদ্ধির সম্ভাবনায় ইংরেজরা চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহারা নাসিরজঙ্গের এবং কর্ণাটকের মৃত নবাবের পুত্র মহম্মদ আলীর পক্ষ গ্রহণ করিল। তাহাদের এই কাজের ফলে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

ডুপ্লে

যুদ্ধের প্রথম দিকে ডুপ্লেরই জয় হইল। মুজাফ্ফরজঙ্গ হায়দরাবাদের নিজাম হইলেন। ঐ রাজ্যে ফরাসী প্রাধান্য স্থাপিত হইল। কিন্তু কর্ণাটকে ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইভের নিকট ডুপ্লের তাঁবেদার চাঁদ সাহেবকে হার মানিতে হইল।

ইহার অল্পকাল পরেই ডুপ্লেকে দেশে ফিরাইয়া আনা হইল। তাঁহার স্থানে যিনি ফরাসী ভারতের শাসনকর্তা হইয়া আসিলেন, তাঁহার রণকৌশলের অভাব ছিল না, কিন্তু তাঁহার মেজাজ ভাল ছিল না। তিনি তাঁহার সহকারী সেনানায়কদের সহযোগিতা লাভ করিতে পারেন নাই। ফলে তাঁহার পরাজয় হইল। এই পরাজয়ের ফলে ভারতবর্ষে ফরাসী শাসন প্রতিষ্ঠার আশা অনেক দিনের জন্য চলিয়া গেল। এই সুযোগে ডুপ্লের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইভ ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি পত্তন করিলেন।

বঙ্গদেশে ইংরেজদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা: ফরাসীদের পরাজয়ের ফলে দক্ষিণ ভারতের এক বড় অংশে ইংরেজদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত

হয়। ইহার পূর্বে তাহারা বঙ্গদেশে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। বঙ্গদেশে ইংরেজদের প্রধান কুঠি ছিল কলিকাতায়। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে **জব চার্ণক** নামে একজন ইংরেজ কর্মচারী সুতানটি, গোবিন্দপুর, কালীঘাট, প্রভৃতি গ্রাম লইয়া এই নগরীর পত্তন করেন। এইস্থানে একটি দুর্গও নির্মিত হয়। ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়মের নামানুসারে ইহার নাম হয় ফোর্ট উইলিয়ম। অল্পকাল মধ্যেই কলিকাতা ইংরাজদের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হইয়া উঠে। ক্রমে ইহা তাহাদের রাজনৈতিক প্রভাবেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিতে পরিণত হয়।

লর্ড ক্লাইভ

এই রাজনৈতিক প্রভাব দেখিয়া বঙ্গদেশের নবাব **সিরাজদ্দৌলা** বিশেষ বিচলিত হন। ফলে, ইংরেজদের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য আরম্ভ হয়। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইভ সিরাজের শত্রুদের সহিত চক্রান্ত করেন এবং পলাশীর যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করিয়া **মীরজাফরকে** বঙ্গদেশের সিংহাসনে স্থাপিত করেন। কিন্তু মীরজাফর ছিলেন ইংরেজদের খেলার পুতুল মাত্র। প্রকৃতপক্ষে তাহারাই এদেশের শাসন পরিচালনা করিতে লাগিল।

নবাব সিরাজদ্দৌলা

কিছুকাল পরে তাহারা মীরজাফরকে সরাইয়া দিয়া তাঁহার জামাতা মীরকাশিমকে বঙ্গদেশের নবাবী দেয়। মীরকাশিম কিন্তু ইংরেজদের তাঁবেদার হইয়া থাকিতে চাহিলেন না, স্বাধীন ভাবে রাজ্যে শাসন করিবার উদ্যোগ করিলেন। ফলে তাঁহার সহিত ইংরেজদের বিরোধ আরম্ভ হইল। মীরকাশিম **বক্সারের যুদ্ধে** পরাজিত হইলেন। তাঁহার পরাজয়ের ফলে বঙ্গদেশে ইংরেজদের প্রভুত্ব আরও দৃঢ় হইল।

মীরকাশিম

শাহ আলম কর্তৃক দেওয়ানী মঞ্জুর

১৭৬২ খৃষ্টাব্দে ক্লাইভের চেষ্টায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট হইতে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার কর আদায়ের অধিকার বা দেওয়ানী লাভ করেন। ঐ অঞ্চলে

দিল্লীর সম্রাটের তখন কোন প্রভুত্ব ছিল না, কিন্তু তখনও তাঁহার প্রভাব ছিল। লোকে সহসা তাঁহার আদেশ অমান্য করিতে চাহিত না। তাই তাঁহার নিকট হইতে দেওয়ানী লাভ করায় বাংলা ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কোম্পানীর প্রভুত্ব দৃঢ়তর হইল।

নবাবের পদ তখন উঠাইয়া দেওয়া হইল না। কিন্তু তিনি শুধু সাক্ষীগোপালের অভিনয় করিতে লাগিলেন। **ওয়ারেন হেস্টিংস** এই অভিনয় পর্যন্ত বন্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহার সময়ে কোম্পানী নবাবের পদ উঠাইয়া দিয়া বঙ্গদেশের শাসনভার পরিচালনা করিতে আরম্ভ করেন।

ভারতে ইংরেজ রাজ্যের বিস্তার ঃ ফরাসী শক্তির পতন ও বঙ্গদেশ অধিকারের ফলে ভারতবর্ষে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের সূচনা হইল। এখন হইতে ইংরেজদের প্রধান কাজ হইল, এই রাজত্বকে নির্বিঘ্ন করা ও উহার সীমা বাড়াইয়া তোলা। এই উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে অনেক যুদ্ধ করিতে হইয়াছে, অনেক স্বাধীন রাজ্যকে অধীন করিতে হইয়াছে। আমরা সংক্ষেপে তাহাদের এই সব কাজের উল্লেখ করিতেছি।

সর্বপ্রথমে আমরা মহিশূরের সহিত ইংরেজদের সম্পর্কের কথা বলিতেছি। মহিশূর ছিল দক্ষিণ ভারতের একটি ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্য। কুশাসন ও বিরোধের ফলে ইহার অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে হায়দর আলী নামে একজন সেনানায়ক মহিশূরের সিংহাসন অধিকার করেন এবং উহাকে একটি প্রথম শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত করেন। **হায়দর আলীর** জন্ম হইয়াছিল সামান্য সিপাহীর ঘরে। তাঁহাকে অনেক দুঃখ ও ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল, প্রবল শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু কোনও প্রতিকূল শক্তিই তাঁহার মনের অজেয় সংকল্প দমিত

করিতে পারে নাই। ঐ সংকল্প সফল করিবার উপযোগী গুণেরও তাঁহার অভাব ছিল না। তাঁহার স্বাস্থ্য ছিল, বল ছিল, রণকৌশল ছিল, সাংসারিক জ্ঞান ছিল, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল। তাঁহার দুইটি চোখের দিকে চাহিলেই এই বুদ্ধির সুস্পষ্ট আভাষ পাওয়া যাইত। তিনি লেখাপড়া জানিতেন না, তবুও রাজ্যশাসনে তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। ন্যায়ের প্রতি তাঁহার অকপট অনুরাগ ছিল। তিনি প্রতিশ্রুতি পালন করিতে কখনও দ্বিধা করিতেন না। ধর্মসম্বন্ধে তাঁহার মত ছিল অতি উদার। তিনি তাঁহার অধীন রাজপুরুষদের ধর্মমতের উপরে হস্তক্ষেপ করিতেন না। রাজ্যের ছোটখাট বিষয়গুলির প্রতিও তাঁহার দৃষ্টি ছিল। তিনি সমস্ত দিন পরিশ্রম করিতেন, তবু কেহ তাঁহার সহিত দেখা করিতে চাহিলে তিনি তাহাকে নিরাশ করিতেন না। এই সব কারণে তিনি সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা ও প্রীতির অধিকারী হইয়াছিলেন।

হায়দর আলী

হায়দরের প্রভাব দেখিয়া ইংরেজদের ভয় হয়। তাহারা তাঁহার শত্রুদের সহিত চক্রান্ত করে, তাঁহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিতেও দ্বিধা করে না। ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে একাধিক যুদ্ধ হয়। একবার হায়দর মাদ্রাজের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন এবং ঐ স্থানের ইংরেজদিগকে তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য করেন, কিন্তু এই

সন্ধি স্থায়ী হয় নাই। কিছুকাল পরে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হয়, হায়দর একাধিক ইংরেজ সেনাপতিকে পরাজিত করেন। এই পরাজয়ের সুযোগ লইবার পূর্বে কিন্তু তাঁহাকে পৃথিবী হইতে বিদায় লইতে হয়।

* হায়দরের মৃত্যুর পর তাঁহার সুযোগ্য পুত্র টিপু মহিশূরের সুলতানী লাভ করেন। টিপু ছিলেন পিতার মতই সরল ও সদাশয়। তিনি ছিলেন সুনিপুণ সেনা-নায়ক ও সুচতুর শাসনকর্তা। তাঁহার চরিত্র ছিল সুনির্মল। বিদ্যার প্রতি তাঁহার আকর্ষণ ছিল গভীর। স্বাধীনতার প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল অচঞ্চল। এই স্বাধীনতাপ্রিয়তার ফলেই তিনি ইংরেজের চক্ষুশূল হন। তাঁহারা তাঁহাকে কোম্পানীর প্রতি অনুগত হইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু টিপু ঘৃণার সহিত এই অনুরোধ উপেক্ষা করেন। তখন ইংরেজেরা নিজাম ও মারাঠাদের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। টিপু নির্ভয়ে যুদ্ধের সম্মুখীন হন। শত্রুরা জনপদের পর জনপদ জয় করিয়া টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন আক্রমণ করেন এবং উহার অবরোধ চূর্ণ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করেন। টিপু বুঝিলেন জয়ের আর সম্ভাবনা নাই, তবুও তিনি পলায়ন করিলেন না। যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করিয়া তিনি অমর মহিমার অধিকারী হইলেন।

টিপু সুলতান

মহিশূর জয় করিয়াও ইংরেজেরা ভারতে প্রভুত্ব লাভ করিতে পারিল না। ঐ প্রভুত্ব লাভ করিবার পূর্বে তাহাদিগকে মারাঠা শক্তির সহিত তিনবার যুদ্ধ করিতে হয়।

(মারাঠা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন মহারাজ শিবাজী। শিবাজীর মৃত্যুর পরে ঐ রাজ্যটি একটি সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। দক্ষিণ ভারতের এক বড় অংশ, এমন কি, উত্তর ভারতের কতক অংশ পর্যন্ত ঐ সাম্রাজ্যের অধীন হয়। যাঁহাদের নেতৃত্বে মারাঠা সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠে, তাঁহাদিগকে বলা হইত পেশোবা। পেশোবারা প্রথমে ছিলেন মারাঠা নরপতিদের মন্ত্রী, পরে তাঁহারা সাম্রাজ্যের কর্তা হইয়া উঠেন।

শিবাজী

তৃতীয় পেশোবা বালাজী বাজীরাও-এর শাসনকালে মারাঠা সাম্রাজ্য চরম গৌরব লাভ করে। বালাজী বাজীরাও পাঞ্জাব পর্যন্ত জয় করেন। কিন্তু এই পাঞ্জাব জয়ের ফলে মারাঠাদের সহিত আফগানিস্থানের অধিপতি আহম্মদ শাহ্ দুরাণীর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ হয় পানিপথে। তাই ইতিহাসে ইহা **পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ** বলিয়া পরিচিত। যুদ্ধে মারাঠাদের পরাজয় হয়। পরাজয়ের ফলে তাহাদের সাম্রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়ে।

চতুর্থ পেশোবা মাধবরাও মারাঠা শক্তিকে আবার সবল করিয়া তোলেন। কিন্তু অকালে তাঁহার মৃত্যু হয়। পরবর্তী পেশোবা নারায়ণ রাও শত্রুর চক্রান্তে নিহত হন।

নারায়ণ-এর মৃত্যু হইলে পেশোবার পদ লইয়া তাঁহার পিতৃব্য

রঘুনাথ ও শিশুপুত্র মাধবরাও নারায়ণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। রঘুনাথের অনুরোধে ইংরেজেরা তাঁহার পক্ষ গ্রহণ করেন। ফলে মারাঠাদের সহিত ইংরেজের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধ ইতিহাসে প্রথম মারাঠা যুদ্ধ বলিয়া পরিচিত। মাধবরাও নারায়ণের প্রধান সহায় ছিলেন চতুর মারাঠা নেতা নানা ফড়নবীশ। নানা ফড়নবীশ মহিশূর, হায়দরাবাদ প্রভৃতি ভারতীয় রাজ্য লইয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী সংঘ গড়িয়া তোলেন। এই সংঘের আঘাতের ফলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠে।

নানা ফড়নবীশ

এই সময়ে ভারতবর্ষের প্রধান শাসনকর্তা ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। তাঁহার প্রতিভা ছিল অসাধারণ। এই প্রতিভা বলে তিনি কোম্পানীর সংকটত্রাণ করেন। তিনি নিজামকে শত্রু হইতে মিত্রে পরিণত করেন, মাধবরাও নারায়ণকে পেশোবা বলিয়া স্বীকার করিয়া মারাঠাদের সহিত সন্ধি করেন এবং মহিশূরের সুলতানকে সন্ধি করিতে সম্মত

ওয়ারেন হেস্টিংস

করান। এইরূপে ইংরেজ বিরোধী সংঘের অবসান হয় এবং ইংরেজ শক্তি আরও দৃঢ় হইয়া উঠে।

ইংরেজরা প্রথম মারাঠা যুদ্ধে মারাঠাদের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হয়। তবুও ঐ যুদ্ধের ফলে মারাঠাদের শক্তি অনেকটা দুর্বল হইয়া পড়ে। নানা ফড়নবীশের মৃত্যুর পরে তাহাদের সাম্রাজ্যের একতাও চলিয়া যায় এবং অন্তর্বিরোধ আরম্ভ হয়। এই অনৈক্য ও অন্তর্বিরোধের সুযোগ লইয়া ইংরেজেরা মারাঠা সর্দারগণকে অধীন করিতে আরম্ভ করিল। ফলে মারাঠাদের সহিত তাহাদের আরও দুইটি যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধ দুইটির নাম দ্বিতীয় ও তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধ। দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধের ফলে মারাঠা শক্তি পূর্বাপেক্ষাও দুর্বল হইল এবং তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধের ফলে ঐ শক্তি একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল। এইরূপে মোগল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া মারাঠারা যে বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল সেই সাম্রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীন হইল।

মারাঠাদের সহিত যুদ্ধের সময় ইংরেজেরা একটি নূতন নীতির অনুসরণ করিতে আরম্ভ করে। এই নীতির নাম হইল, 'অধীনতা মূলক মিত্রতা'। যে রাজা এই নীতি গ্রহণ করিতেন, ইংরেজেরা তাঁহাকে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিবার দায়িত্ব লইত। ইহার বিনিময়ে ঐ রাজা তাঁহার রাজ্যের কিছু অংশ ও সৈন্য বিভাগের নিয়ন্ত্রণ ইংরেজদের হাতে ছাড়িয়া দিতেন। তাঁহাকে আরও কথা দিতে হইত, তিনি অন্য কোন রাজ্যের সহিত সন্ধি বা যুদ্ধ করিবেন না, করিলে ইংরেজদের অনুমতি লইয়া করিতে হইবে। হায়দরাবাদের নিজাম ও অযোধ্যার নবাব এই নীতি গ্রহণ করিলেন। কিন্তু নবাবের ইহাতে বিশেষ সুবিধা হইল না। অল্পকাল পরেই কুশাসনের অজুহাতে ইংরেজেরা তাঁহার রাজ্য কাড়িয়া লইল। তাহারা কর্ণাটকেও আপনাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিল।

এইবার আসিল শিখদের পালা। ইহারা বহুদিন ধরিয়া মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ইহাদের মধ্যে এক প্রতিভাশালী নেতার আবির্ভাব হইল। তাঁহার নাম রণজিৎ সিংহ। রণজিৎ সিংহ ছিলেন একজন শিখ সর্দারের পুত্র। তিনি ছিলেন কতকটা খর্বকায়, কিন্তু তাঁহার হাত দুইখানি অত্যন্ত দীর্ঘ ছিল। পোশাক পরিচ্ছদের প্রতি তাঁহার বিশেষ নজর ছিল না। তাঁহার সমস্ত মুখ ভরিয়া ছিল বসন্তের দাগ। শৈশবে তাঁহার একটা চক্ষু নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তিনি যখন ঘোড়ায় চড়িয়া তাঁহার সৈন্যদের পুরোভাগে চলিতেন, তখনই তাঁহার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইত। তাঁহার রূপ ছিল না, কিন্তু রাজমহিমা ছিল। তাঁহার আচরণে ঔদ্ধত্য ছিল না, ছিল সুস্নিগ্ধ সৌজন্য। একজন ইউরোপীয় তাঁহাকে নেপোলিয়নের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলিয়াছেন; আর একজন তাঁহাকে আকবরের সহিত তুলনা করিয়াছেন। তিনি বহুগুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন একধারে দুর্দম, দিগ্বিজয়ী ও ধীরস্থির রাষ্ট্রনায়ক। তিনি রাজ্যের পর রাজ্য জয় করিতে পারিতেন, আবার বিজিত অঞ্চলগুলিতে শান্তি ও শৃঙ্খলায় ভরিয়া তুলিতেও জানিতেন। ন্যায়ের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠা ছিল, অপর ধর্মের প্রতি তাঁহার সহিষ্ণুতা ছিল; প্রজাদের প্রতি তাঁহার প্রীতি ছিল।

রণজিৎ সিংহ

রণজিৎ সিংহের আকাঙ্ক্ষা ছিল, তিনি সমস্ত শিখদিগকে লইয়া একটি অখণ্ড শিখরাজ্য গড়িয়া তুলিবেন। তিনি তাঁহার এই আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণভাবে সফল করিতে পারেন নাই। শতদ্রু নদীর পূর্বতীরে যে সকল শিখ বাস করিত, তিনি তাহাদিগকে তাঁহার অধীনে আনিতে পারেন নাই। কিন্তু শতদ্রুর পশ্চিম তীরের সকল শিখকে লইয়া তিনি একটি শক্তিশালী রাজ্য গঠন করেন। সুনিপুণ ফরাসী সেনানায়কদের সাহায্যে শিক্ষিত করিয়া তিনি তাঁহার সেনানায়কদের অজেয় করিয়া তোলেন এবং ইহাদের সাহায্যে ঐ রাজ্যটিকে একটি সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। পাঞ্জাবের এক বড় অংশ কাশ্মীর, পেশোয়ার এবং হাজারা ঐ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ইংরেজেরা ভারতবর্ষের মধ্যে ঐরূপ একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিতে দেখিয়া ভীত হইল। কিন্তু তাহারা রণজিৎ সিংহের সহিত বিরোধ করিতে সাহস করিল না। তাহারা সুসময়ের প্রতীক্ষায় দিন গণিতে লাগিল। মহারাজা রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পরে ঐ সুসময় উপস্থিত হইল। শিখ রাজ্যে অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। ঐ অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলার সুযোগ লইয়া ইংরেজেরা পাঞ্জাব ও কাশ্মীর জয় করিয়া লইল। দুইবার ভীষণ যুদ্ধ করিয়া তাহারা এই কাজ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। দুই যুদ্ধেই শিখেরা অসামান্য বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের নেতাদের ভীরুতা ও বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তাহারা পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হয়। তাহাদের এই পরাজয়ের ফলে বৃটিশ ভারতের সীমা আফগানিস্থানের পর্বতমালার পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। প্রায় এই সময় সিন্ধুদেশ ও ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত পেগু ইংরেজদের শাসনাধীন হয়। এইভাবে ইংরেজেরা সমস্ত ভারতবর্ষ, এমন কি উহার বাহিরেও তাহাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করে।

সিপাহী বিদ্রোহঃ ইংরেজদের প্রভুত্ব বিস্তারে ভারতীয়েরা সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। এই অসন্তোষ বিশেষভাবে দেখা দেয় সিপাহীদের মধ্যে। শেষে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ্যে তাহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইতিহাসে এই বিদ্রোহ 'সিপাহী বিদ্রোহ' বলিয়া পরিচিত। বিদ্রোহীরা ভারতবর্ষে ইংরেজদের প্রভুত্ব ধ্বংসপ্রায় করিয়া তোলে এবং নামে মাত্র মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌কে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়া বাদশাহী যুগের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করে।

দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্

যাঁহারা বিদ্রোহীদিগকে পরিচালিত করেন তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন 'ঝাঁন্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ'। তাঁহার পুত্র সন্তান নাই—এই অজুহাতে ইংরেজরা তাঁহার রাজ্যটি কাড়িয়া লইয়াছিল। এ পাপের ফলে বহু ইংরেজকে প্রাণ হারাইতে হইল। লক্ষ্মীবাঈ ঝাঁন্সীর বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া পুরুষের বেশে যুদ্ধ করিতেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে হাজার হাজার লোক অনুপ্রেরণা লাভ করিল।

লক্ষ্মীবাঈ

ভারতে
বৃটিশ সাম্রাজ্যের
বিস্তার
কাশ্মীর
বৃটিশ
বেলুচিস্তান
পাঞ্জাব
অযোধ্যা
রাজপুতানা
আসাম
বিহার
সিন্ধু
বঙ্গদেশ
কলিকাতা
মালব
সুরাট
বেরার
উড়িষ্যা
বোম্বাই
নিজামের
রাজ্য
মহীশূর
মাদ্রাজ
ত্রিবাঙ্কুর
সিংহল
বৃটিশ অধিকার ১৭৮৫ খৃঃ
রাজ্যবিস্তার
১৭৮৫-১৮০৫ খৃঃ
রাজ্যবিস্তার ১৮০৫-১৮১১ খৃঃ
রাজ্যবিস্তার ১৮১১-১৮৫৮ খৃঃ
রাজ্যবিস্তার ১৮৫৮ খৃঃ পরে
আশ্রিত রাজ্য
(সাদা
অংশ)
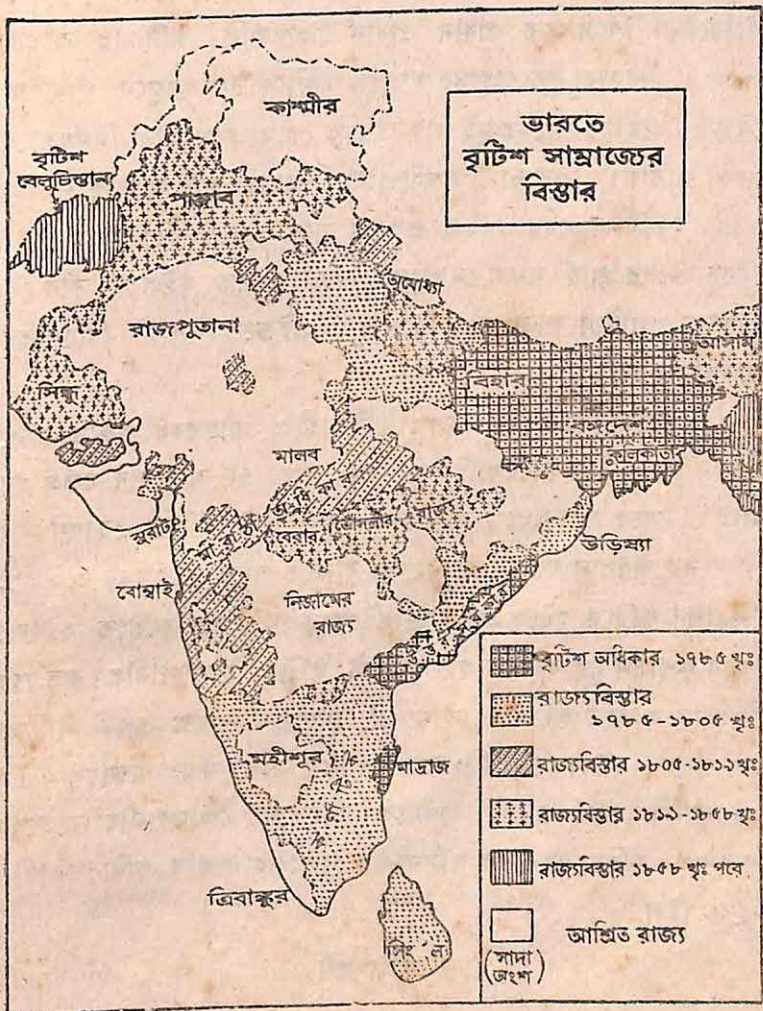
বিদ্রোহীদের মধ্যে কিন্তু একতা ছিল না, তাহাদের লক্ষ্যও অভিন্ন ছিল না। সুতরাং শেষ পর্যন্ত তাহাদের পরাজয় হইল। ইংরেজেরা বিদ্রোহের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলি অধিকার করিয়া লইল। তাহারা বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ্‌কে বন্দী করিয়া রেঙ্গুনে পাঠাইয়া দিল। বাহাদুর শাহের দুই পুত্র ও এক পৌত্রকে তাহারা নির্মমভাবে হত্যা করিল। কিন্তু রানী লক্ষীবাঈকে তাহারা বন্দী করিতে পারিল না। তিনি শত্রুদের সহিত প্রকাশ্য যুদ্ধে মৃত্যুকে বরণ করিলেন। বিদ্রোহীদের প্রায় সকল নেতাকেই বন্দী হইতে হইল। তবে দুই একজন পলাইয়া আত্মরক্ষা করিলেন। এইরূপে সিপাহী বিদ্রোহের অবসান হইল।

সিপাহী বিদ্রোহের ফল : সিপাহীরা ভারতবর্ষ হইতে বৃটিশ শাসন দূর করিতে চাহিয়াছিল। তাহাদের এই অভিলাষ সফল হয় নাই। তবে তাহাদের বিদ্রোহের ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবসান হয়। ইংরেজেরা বুঝিতে পারে, তাহাদের অধিকার নিরাপদ করিতে হইলে এই দেশ হইতে কুশাসন দূর করিতে হইবে। আর কুশাসন দূর করিতে হইলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃত্বের অবসান করিতে হইবে। কারণ ঐ কোম্পানী মূলতঃ একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান। উহার নিকট হইতে সুশাসন আশা করা অন্যায়। এই অনুভূতির ফলে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে কোম্পানীর রাজত্বের অবসান করিয়া এদেশের শাসনভার ইংলণ্ডের রানীর পরিচালনাধীন করা হইল।

কালপঞ্জী

খৃঃ ১৭৫৭ পলাশীর যুদ্ধ

খৃঃ ১৭৬১ কর্ণাট যুদ্ধে ফরাসীদের পরাভব

খৃঃ ১৭৬৪ বক্সারের যুদ্ধ

খৃঃ ১৭৬৫ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ
" ১৭৯৯ মহিশূরের পতন
" ১৮১৯ মারাঠা শক্তির পতন
" ১৮৩৯ রণজিৎ সিংহের মৃত্যু
" ১৮৪৩ সিন্ধু বিজয়
" ১৮৪৯ পাঞ্জাব অধিকার
" ১৮৫২ পেগু অধিকার
" ১৮৫৭ সিপাহী বিদ্রোহ
" ১৮৫৮ কোম্পানীর রাজত্বের অবসান

অনুশীলনী

১। কি ভাবে ইংরেজেরা বঙ্গদেশে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করে ?

২। হায়দর আলীর চরিত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৩। কি কারণে মহিশূরের সহিত ইংরেজদের সংঘর্ষ হয় ? ঐ সংঘর্ষের কি ফল হয় ?

৪। কি কারণে টিপু ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়াছেন ?

৫। ইংরেজেরা কি ভাবে মারাঠাদের সাম্রাজ্য কাড়িয়া লয় ?

৬। মহারাজ রণজিৎ সিংহের জীবনের কি লক্ষ্য ছিল ? ঐ লক্ষ্য সফল করিয়া তুলিতে তিনি কতদূর সমর্থ হইয়াছিলেন ?

৭। সিপাহী বিদ্রোহের কারণ ও ফলাফল বিশ্লেষণ কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আমেরিকার বিপ্লব ও যুক্তরাষ্ট্রের সংগঠন

উত্তর আমেরিকায় ইংলণ্ডের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার উল্লেখ করিয়াছি। কিরূপে ঐ সব উপনিবেশের সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধি হইল এবং কিরূপে তাহারা লণ্ডনের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া একটি বিরাট রাষ্ট্রে পরিণত হইল, এই অধ্যায়ে আমরা সেই সব কথা বলিতেছি।

যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পূর্বযুগ ঃ উপনিবেশগুলির প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয় খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকে। ঐ প্রতিষ্ঠার মূলে ইংরেজ সরকারের হাত ছিল না, উহা বে-সরকারী উদ্যমেরই ফল। মাঝে মাঝে এক একদল ইংরেজ দেশ হইতে রওনা হইয়া আটলান্টিক মহাসাগর পার হইয়া আমেরিকার উপকূলে আসিয়া পৌঁছিত।

তাহারা দেখিত তাহাদের চারিদিকে বিস্তৃত রহিয়াছে নিবিড় অরণ্য। ঐসব অরণ্যে বাস করিত অসংখ্য হিংস্র জানোয়ার, আর ঐ জানোয়ারদের চেয়েও ভয়ঙ্কর রেড ইণ্ডিয়ান দল। রেড ইণ্ডিয়ানরা শ্বেতকায় লোকদিগকে একেবারেই দেখিতে পারিত না এবং সুযোগ পাইলেই তাহাদিগকে হত্যা করিয়া তাহাদের বস্তিগুলি ভাঙ্গিয়া দিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু যাহারা মহাসাগর পাড়ি দিতেও ভয় করে নাই, তাহারা এই সব বিপদেও ভীত হইল না।

তাহারা যুদ্ধের পর যুদ্ধ করিয়া রেড ইণ্ডিয়ানগণকে পরাজিত করিল, বনজঙ্গল পরিষ্কার করিয়া বসতির পর বসতি স্থাপন করিল। তারপর তাহারা ধর্মমন্দির, বিদ্যায়তন, গ্রন্থাগার, প্রমোদ নিকেতন প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া ঐসব বসতিকে সভ্য জীবনের উপযোগী করিয়া তুলিল। এইরূপে তাহাদের প্রয়াসের ফলে তেরটি উপনিবেশ গড়িয়া

উঠিল। এইসব উপনিবেশের অধিবাসীরা ইংরেজ সরকারের অধীন হইলেও, অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ঘরোয়া ব্যাপারে অনেক পরিমাণেই স্বাধীনভাবে চলিতে পারিত। অবশ্য তাহাদের বাণিজ্যের উপর কতকগুলি বিধিনিষেধ ছিল। কিন্তু ঐসব বিধিনিষেধ প্রায়ই কার্যকরী হইত না। ঔপনিবেশিকেরাও ঐগুলি অনেক সময় এড়াইয়া চলিত।

বিপ্লবের কারণ ঃ অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে কিন্তু ইংরেজ শাসনকর্তাদের ঔপনিবেশিক নীতির পরিবর্তন হইল। উপনিবেশ রক্ষা করিবার দায়িত্ব তাহাদিগকে বহন করিতে হইত। এইজন্য ইংলণ্ডের অনেক অর্থ ব্যয় হইত। ইংরেজ মন্ত্রীরা স্থির করিলেন, ঐ অর্থের এক অংশ ঔপনিবেশিকদের নিকট হইতে আদায় করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা উহাদের ব্যবসার উপরে পুরাতন বিধিনিষেধগুলি কঠোরভাবে কার্যকরী করিতে আরম্ভ করিলেন। এমন কি তাঁহারা নূতন নূতন শুল্ক স্থাপন করিতেও দ্বিধা করিলেন না।

এই পরিবর্তিত নীতি কিন্তু মোটেই সময়োচিত হয় নাই। পূর্বে উত্তর আমেরিকায় ফরাসীদেরও প্রভুত্ব ছিল। ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের মনে ভয় ছিল, ফরাসীরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া উপনিবেশগুলি জয় করিয়া লইতে পারে। সুতরাং তাহারা ইংরেজ সরকারকে চটাইতে সাহস করিত না। কিন্তু খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে ইংরেজরা কানাডা জয় করে। এই জয়ের ফলে উত্তর আমেরিকা হইতে ফরাসী প্রভুত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের মন হইতে ফরাসী ভীতি দূর হয়। ইংরেজ সরকারের উপর নির্ভর করিবার প্রয়োজন চলিয়া যাওয়ায় ঐ সরকারের স্বেচ্ছাচার সহ্য করিতে তাহারা ক্রমেই অনিচ্ছুক হইতে থাকে। দুঃখের বিষয় ঠিক এই সময়েই ইংরেজ শাসনকর্তারা

তাহাদের ঔপনিবেশিক নীতির পরিবর্তন করেন। ফলে উপনিবেশগুলিতে ইংরেজ বিরোধী মনোভাব তীব্রতর হইয়া উঠে।

ইংরেজ শাসনকর্তারা এই মনোভাব গ্রাহ্য করিলেন না। বরং তাঁহারা একটি কর স্থাপন করিলেন। আদালতের দলিলপত্রাদিতে ব্যবহৃত টিকিটের উপর এই কর বসান হইল। ঔপনিবেশিকেরা ঐ টিকিট কিনিতে সম্মত হইল না। তাহারা টিকিট করের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করিল। এই আন্দোলন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ইংলণ্ডের একাধিক উদারহৃদয় মনীষীও উপনিবেশিকদের দাবী অনুমোদন করিলেন। ঐ মনীষীদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইলেন বাগ্মীশ্রেষ্ঠ বার্ক এবং ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী চ্যাথাম। বার্ক ও চ্যাথাম উভয়েই পার্লামেণ্টে ঔপনিবেশিকদের সহিত বিরোধ না করিবার জন্য তাহাদের স্বদেশবাসীদের নিকট আকুলভাবে অনুরোধ জানাইলেন। (ইংরেজ শাসনকর্তারা এই সব হিতোপদেশে কান দিলেন না। তাঁহারা কিছুতেই আপনাদের ভুল বুঝিতে চাহিলেন না। তাঁহারা আরও কয়েকটি পণ্যদ্রব্যের উপর নূতন শুল্ক বসাইলেন। ঔপনিবেশিকেরা ঐ সব পণ্যদ্রব্য বয়কট করিয়া তাহাদের একতা ও দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় দিল। যে সকল পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক বসান হইয়াছিল, চা ছিল তাহাদের অন্যতম। বোস্টন বন্দরে চা বোঝাই জাহাজ আসিলে ঔপনিবেশিকদের কতক সংখ্যক লোক রেড ইণ্ডিয়ানদের পোষাক পরিয়া জাহাজে আরোহণ করিল

বার্ক

এবং অনেকগুলি চা বোঝাই বাক্স সমুদ্রের অতল জলে ফেলিয়া দিল।

বিপ্লবের আরম্ভ : তাহাদের এই দুঃসাহসিক কাজের ফলে উপনিবেশসমূহের লোকদের আনন্দের অবধি রহিল না, কিন্তু ইংরেজ শাসনকর্তাদের ক্রোধের আর সীমা রহিল না। যাহারা ঐ কাজের প্রতি সহানুভূতিশীল, তাঁহাদিগকে দণ্ডিত করিবার জন্য তাঁহারা অধীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা সৈন্য পাঠাইতেও দ্বিধা করিলেন না। সৈন্য দেখিয়া ঔপনিবেশিকেরা ভীত হইল না, তাহারা আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এই উত্তেজনার ফলে সৈন্যদের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ হইল। সংঘর্ষের পথে শান্তি আসে না, আসে যুদ্ধ। ঔপনিবেশিকেরা স্বাধীনতা রক্ষার প্রেরণায় সানন্দে যুদ্ধ বরণ করিয়া লইল। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তাহারা অমিত উদ্দীপনার মধ্যে আপনাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। ঐ পরম দিনটি তাহাদের বংশধরেরা আজিও **'জাতীয় দিবস'** রূপে পালন করিয়া উহার পুণ্যস্মৃতিকে প্রাণবন্ত করিয়া রাখে।

তাহাদের স্বাধীনতা ঘোষণাকে সার্থক করিয়া তুলিতে কিন্তু তাহাদিগকে বহু বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। যুদ্ধের পরিণাম ছিল অনিশ্চিত। ইংরেজদের ধনবল ও জনবলের তুলনা ছিল না। কিন্তু তাহাদের অসুবিধাও ছিল। তাহাদের মধ্যে এমন লোক ছিল, যাহারা ঐ যুদ্ধ পছন্দ করিত না। তারপর ফরাসীরা ঔপনিবেশিকদের পক্ষে যোগ দিয়া ইংরেজদের কাজ আরও কঠিন করিয়া তুলিল। অপরদিকে ঔপনিবেশিকদের সম্পদ ও শক্তি ছিল অনেক অল্প। কিন্তু তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার অজেয় সংকল্প ছিল, আর ছিল ঐ সংকল্প সফল করিয়া তুলিবার যোগ্য একজন সর্বাধিনায়ক। এই সর্বাধিনায়কের নাম **জর্জ ওয়াশিংটন**।

১। রোডস্ আয়ল্যাণ্ড, ২। নিউ হ্যাম্পসায়ার, ৩। ম্যাসাচুসেটস্, ৪। কনেক্‌টিকাট্, ৫। নিউ ইয়র্ক, ৬। পেন্সিলভেনিয়া, ৭। ভার্জিনিয়া, ৮। নিউজার্সি, ৯। ডেলাওয়ার, ১০। মেরীল্যাণ্ড, ১১। উঃ কেরোলিনা, ১২। দঃ কেরোলিনা, ১৩। জর্জিয়া।

ওয়াশিংটন ছিলেন স্বাধীনতা যুগের প্রাণ। তাঁহার ছিল অপরিমেয় দেশভক্তি, ক্ষুরধার বিচার শক্তি এবং অদম্য মনোবল। পরাজয় তাঁহাকে অবসন্ন করিত না, আবার বিজয় তাঁহাকে উদ্ধত করিত না। সততা, ধীরতা, উদারতা ও আত্মসংযম ছিল তাঁহার চিরসাথী। তাঁহার প্রভাব ছিল অসাধারণ, লোকে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিলে আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিত। তাঁহার স্থান ছিল দলাদলির ঊর্ধ্বে। তাঁহার মধ্যে তাঁহার দেশবাসীর আশা ও আদর্শ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

জর্জ ওয়াশিংটন

ইংরেজ পক্ষের প্রধান সেনাপতি ছিলেন লর্ড কর্ণওয়ালিস। পরে তিনি ভারতের প্রধান শাসনকর্তার পদ লাভ করেন। কর্ণওয়ালিসের সামরিক গুণের অভাব ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহাকেও পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। তিনি তাঁহার পরিচালিত সমস্ত ইংরেজ বাহিনী সহ আমেরিকানদের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার এই আত্মসমর্পণের ফলে ইংরেজ সরকারকে ঔপনিবেশিকদের স্বাধীনতা স্বীকার করিতে হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা: স্বাধীনতা লাভ করিবার অল্প কয়েক বৎসর পরে তেরটি উপনিবেশ যুক্তভাবে একটি অখণ্ড রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে। ঐ রাষ্ট্রের নাম যুক্তরাষ্ট্র। ঐ রাষ্ট্রের শাসনভার ন্যস্ত করা হয় জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হস্তে। যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র এখনও মূলতঃ পূর্বের ন্যায় অপরিবর্তিত রহিয়াছে।

স্বাধীনতা লাভের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের জীবনে

অপরিসীম কর্মশক্তির সঞ্চার হয়। এই শক্তির প্রেরণায় তাহারা কৃষি ও শিল্পের অসামান্য উন্নতি সাধন করিয়া তাহাদের দেশ সমৃদ্ধিতে ভরিয়া তোলে। পশ্চিমের দুর্গম বনাঞ্চল পরিচ্ছন্ন করিয়া তাহারা আরও ৩৫টি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করে। এইরূপে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল ভাগ পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ তাহাদের প্রয়াসের ফলে সভ্যতার আলোকে জ্যোতির্ময় হইয়া উঠে।

কালপঞ্জী

খৃঃ ১৭৫৯—৬৩ উত্তর আমেরিকায় ফরাসী প্রভুত্বের অবসান
খৃঃ ১৭৬৫ টিকিট করের প্রবর্তন
খৃঃ ১৭৭৫—৮৩ স্বাধীনতার যুদ্ধ

অনুশীলনী

১। কি কারণে উত্তর আমেরিকার বৃটিশ ঔপনিবেশিকদের সহিত সরকারের সংঘর্ষ হয়।

২। উত্তর আমেরিকার বৃটিশ ঔপনিবেশিকদের সহিত যুদ্ধে কি কারণে বৃটিশ সরকারের পরাজয় হয়।

৩। জর্জ ওয়াশিংটনের গুণাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৪। উত্তর আমেরিকার বৃটিশ ঔপনিবেশিকরা কি ভাবে তাহাদের স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করে ?

———

সপ্তম অধ্যায়

ফরাসী বিপ্লব

আমরা আমেরিকার বিপ্লবের কথা বলিয়াছি। ঐ বিপ্লব শেষ হওয়ার মাত্র ছয় বৎসর পরেই ফরাসী দেশে বিপ্লব আরম্ভ হয়। ঐ বিপ্লব ইতিহাসে 'ফরাসী-বিপ্লব' বলিয়া পরিচিত। উহার ফলে ফরসীদের শুধু রাজনৈতিক নয় সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় জীবনেও গভীর পরিবর্তন দেখা দেয়।

ফরাসী বিপ্লবের কারণ : বিপ্লব হঠাৎ আসে না। যখন কোন অবস্থা দেশের অধিকাংশ লোকের নিকট অসহনীয় হইয়া উঠে, যখন অন্য কোনও উপায়ে উহার প্রতিকার সম্ভব হয় না তখনই লোকেরা বিপ্লবের আশ্রয় লয়। ফরাসী-বিপ্লবও আরম্ভ হইয়াছিল এইভাবে।

বিপ্লবের পূর্বে ফরাসী দেশের অবস্থা অধিকাংশ লোকের নিকটেই অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। অধিকাংশ লোকের নিকট বলিলাম কারণ অভিজাতশ্রেণী ঐ অবস্থায় কোন ত্রুটিই দেখিতে পায় নাই। না পাইবারই কথা, কারণ বিপ্লবের পূর্বে ঐ শ্রেণীর লোকেরাই ছিল ফ্রান্সের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের কর্ণধার। রাজা ছিলেন তাহাদের স্বার্থের বাহক। রাজ্যের সকল বড় বড় পদে তাহাদেরই ছিল একাধিকার। অভিজাতদের অনেকেরই বিশেষ কোন কাজ করিতে হইত না, কিন্তু তাহাদের মোটা মাহিনার অভাব হইত না। তাঁহাদের অনেকে ছিলেন জমিদার। কিন্তু জমিদারির ভার তাহাদিগকে বহন করিতে হইত না, প্রজাদের সুখদুঃখের খবর রাখিতে হইত না। তাঁহারা থাকিতেন নগরে রাজাকে ঘিরিয়া—চন্দ্রকে ঘিরিয়া হিরণ্ময় তারকা শ্রেণীর ন্যায়। আলোকে, পুলকে, গানে, গল্পে, নিত্য নূতন

প্রমোদোৎসবে তাঁহাদের দিন কাটিত। জীবন ছিল তাঁহাদের নিকট আশীর্বাদে পরিপূর্ণ।

ফ্রান্সের অধিকাংশ অধিবাসীর অবস্থা কিন্তু ছিল অভিজাতদের বিপরীত। রাজসভায় আড়ম্বর রক্ষা করিতে এবং রাজ্য শাসন করিতে অজস্র অর্থের প্রয়োজন হইত। এই অর্থ আসিত নানাপ্রকার করের সাহায্যে। অভিজাতশ্রেণীর লোকদিগকে কর দিতে হইত না। সুতরাং উহাদের বোঝা বহন করিতে হইত জনসাধারণকে। কিন্তু

বিশপ, গ্রাম্য যাজক, রাজার সভাসদ, গ্রাম্য অঞ্চলের জমিদার, জজ, ব্যবসায়ী-ভদ্রলোক ও তাঁহার পত্নী এবং কৃষক দম্পতি।

ঐ বোঝা বহন করিবার তাহাদের সামর্থ্য ছিল না। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা ছিল অভিজাতদের অপেক্ষা অনেক বেশী শিক্ষিত এবং সক্রিয়। তবুও জীবনে বড় হইবার তাহাদের সুযোগ ছিল না। বড় বড় চাকরি ছিল তাহাদের নাগালের বাহিরে, শিল্প ও বাণিজ্যে অর্থলাভের সম্ভাবনা ছিল কম। কারণ অতিরিক্ত করের ফলে উহাদের বিকাশ ও প্রসার কমিয়া আসিতেছিল। ফলে, নগরের অনেক লোকই অন্নহীন হইয়া পড়িয়াছিল।

সবচেয়ে শোচনীয় হইয়াছিল কৃষকদের অবস্থা। তাহারা থাকিত জীর্ণকুটীরে নগ্নপ্রায় অবস্থায়। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়াও

তাহারা ভাল করিয়া খাইতে পারিত না। ইহার উপর তাহাদিগকে নানারকম কর দিতে হইত—গ্রামের গীর্জার জন্য কর দিতে হইত, সরকারকে অনেকপ্রকার কর দিতে হইত। ইহার উপর আবার ছিল জমিদারের নানা রকমের জুলুম। তাহাদিগকে জমিদারের উনানে রুটি সেকিতে হইত, জমিদারের গম ভাঙ্গা যন্ত্রে গম ভাঙ্গিতে হইত। এই-সব করার জন্য জমিদারকে পৃথক অর্থ দিতে হইত। তাহারা জমির উন্নতি করিলে জমিদার খাজনা বাড়াইয়া দিতেন। সুতরাং তাহাদের পরিশ্রমই সার হইত। তাহারা সব সময় নিজেদের কাজ করিতে পারিত না। সপ্তাহে কয়েকদিন তাহাদিগকে জমিদারের ক্ষেতে বিনা মাহিনায় কাজ করিয়া দিতে হইত।

ভলটেয়ার

রুশো

এই কারণে ফ্রান্সে গভীর অসন্তোষ আরম্ভ হয়। কয়েকজন চিন্তানায়ক এই অসন্তোষকে তাঁহাদের লেখার দ্বারা আরও তীব্র করিয়া তোলেন। ইহাদের মধ্যে প্রধান হইলেন ভলটেয়ার ও রুশো। ভলটেয়ার সরকারের স্বেচ্ছাচার, সমাজের অসাম্য এবং যাজক সম্প্রদায়ের ধর্মহীনতা কঠোরভাবে আক্রমণ করেন। রুশো প্রচার করেন যে প্রাচীন কালে জনসাধারণই ছিল রাজ্য শাসনের অধিকারী,

সুতরাং ঐ অধিকার তাহাদের আবার ফিরিয়া পাওয়া উচিত। এইসব চিন্তানায়কের প্রচারের ফলে উৎপীড়িত জনসাধারণ প্রচলিত অবস্থা ভাঙ্গিয়া দিবার উৎসাহ লাভ করে। তাঁহাদের এই উৎসাহ আরও বাড়াইয়া তোলে আমেরিকা হইতে প্রত্যাগত ফরাসী স্বেচ্ছা-সৈনিকেরা। তাহারা আমেরিকা হইতে স্বাধীনতার আদর্শ লইয়া ফিরিয়া আসে। সুতরাং ফ্রান্সের রাজনৈতিক ও সামাজিক শৃঙ্খল মোচন করা তাহাদের অবশ্য কর্তব্য হইয়া উঠে।

এই অবস্থার ফলে ফ্রান্স একটি বারুদের কারখানার মত হইয়া উঠে। রাজা ষোড়শ লুইয়ের অবিবেচনার ফলে চারিদিকে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠে।

অনেকদিন ধরিয়া ফ্রান্সের আর্থিক অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতেছিল। অভিজাতশ্রেণীর লোকেরা কর দিত না। ফলে, রাজস্বের পরিমাণ আশানুরূপ হইত না। ইহার একটা বড় অংশ যাইত রাজসভার জাঁকজমক বজায় রাখিতে। ফ্রান্সকে অনেক যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। যুদ্ধ পরিচালনার জন্যও অজস্র অর্থের প্রয়োজন হইত। সুতরাং ফ্রান্সের আয় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছিল। ঋণ করিয়া ঐ ঘাট্‌তি মিটান হইল। পূর্বেই বলিয়াছি ফ্রান্স আমেরিকার যুদ্ধে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যোগ দিয়াছিল। ঐ যুদ্ধের ফলে জাতীয় ঋণভার অসম্ভব রকম বাড়িয়া গেল।

রাজা ষোড়শ লুই

একাধিক মন্ত্রী ব্যয় সংক্ষেপ করিতে রাজাকে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু ব্যয় সংক্ষেপ করিলে অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থ হানি হইতে পারে,

তাই ঐ শ্রেণীর অনেকে আর্থিক সংস্কারে বাধা দিল। রাজা তাহাদের কুমন্ত্রণায় ভুলিয়া সংস্কারের প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন না। ফলে যাহা হইবার তাহাই হইল। ফ্রান্সের আর্থিক বনিয়াদ প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। তবুও রাজার চৈতন্য হইল না। তিনি ব্যয় সংক্ষেপ না করিয়া নূতন কর স্থাপন করিবার সংকল্প করিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ফ্রান্সের (পুরাতন প্রতিনিধি পরিষদ) States General-এর অধিবেশন আহ্বান করিলেন।

প্রায় দুইশত বৎসর ধরিয়া প্রতিনিধি পরিষদের কোন অধিবেশন হয় নাই। রাজা ঐ সভা আহ্বান করিলে দেশময় সাড়া পড়িয়া গেল।

টেনিস কোর্টে প্রতিজ্ঞা

জনসাধারণ প্রতিনিধিদের মাধ্যমে আপনাদের অসন্তোষ প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইল। কিন্তু এই প্রকাশ তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিল। ভয় পাইয়া রাজা স্টেটস্ জেনারেল-এর অধিবেশন ভাঙ্গিয়া উহার সভাগৃহ বন্ধ করিয়া দিলেন।

প্রতিনিধিরা কিন্তু বিচলিত হইল না। নিকটবর্তী একটি টেনিস খেলার মাঠে সমবেত হইয়া তাহারা প্রতিজ্ঞা করিল, সুশাসনের অনুকূলে আইন সংস্কার না করিয়া তাহারা বিচ্ছিন্ন হইবে না। তাহাদের এই দৃঢ়তার ফলে রাজাকে নতি স্বীকার করিতে হইল, স্টেটস্-জেনারেল অধিবেশন আবার আরম্ভ হইল। পূর্বে স্টেটস্ জেনারেলে অভিজাতশ্রেণীর প্রভুত্ব ছিল। এখন উহাতে জনসাধারণের প্রতিনিধিদের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। ঐ সভা ফ্রান্সের জাতীয় সভায় পরিণত হইল। উহার প্রতিনিধিরা আইন সংস্কারে মন দিলেন।
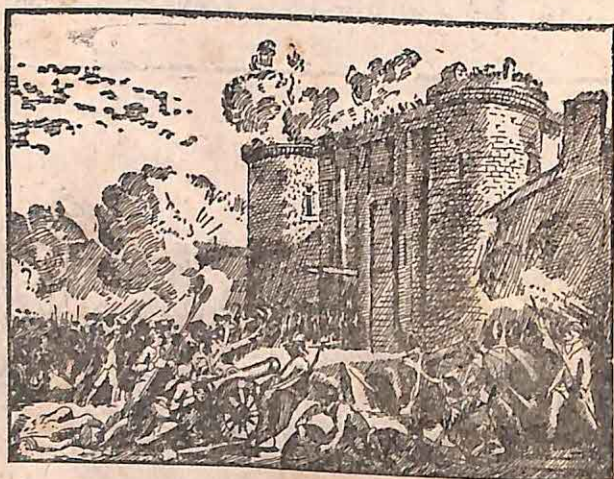
বাস্তিলের পতন

বিপ্লবের আবির্ভাব ঃ আইন প্রণয়ন করা কিন্তু একদিনের কাজ নয়। উহাতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। প্যারিসের অধিবাসীরা কিন্তু দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করিতে সম্মত হইল না। তাহারা দাঙ্গার আশ্রয় লইল। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই তাহারা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। তাহাদের প্রথম আক্রোশ গিয়া পড়িল বাস্তিল নামক দুর্গের উপর। ঐ দুর্গ কারাগাররূপে ব্যবহৃত হইত।

জনতা দুর্গ আক্রমণ করিয়া উহার রক্ষা-ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া ফেলিল এবং উহার মধ্যে যে সকল কয়েদী ছিল তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিল। এই ঘটনা হইতেই ফরাসী-বিপ্লবের আরম্ভ। ইহারই স্মরণে প্রতি বৎসর ১৪ই জুলাই ফ্রান্সে জাতীয় দিবসরূপে উদ্‌যাপিত হয়।

প্যারিসের অধিবাসীরা বাস্তিল ভাঙ্গিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হইল না, তাহারা ঐ মহানগরীর শাসন পরিচালনাও আপনাদের হাতে তুলিয়া লইবার উপক্রম করিল। এই উদ্দেশ্যে তাহারা একটি নগরসভা (commune) ও একটি স্বেচ্ছাবাহিনী (National guard) গঠন করিল। অন্যান্য নগরের অধিবাসীরাও প্যারিসের নাগরিকদের অনুকরণে নগরসভা ও রক্ষাবাহিনী গঠন করিল।

দাঙ্গা আরম্ভ হইলে সহসা উহার শেষ হয় না। উহার প্রভাব ক্রমেই ছড়াইয়া পড়ে। ফ্রান্সেও তাহাই হইল। কৃষকেরাও দাঙ্গায় মাতিয়া উঠিল। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া জমিদারের ঘরবাড়ী আক্রমণ করিল এবং জমিদারির কাগজপত্রে আগুন ধরাইয়া দিল।

দাঙ্গার মধ্যেও জাতীয় পরিষদের কাজ চলিতেছিল। এই কাজের ফলে অভিজাতদের বিশেষ অধিকার বাতিল হইয়া গেল এবং সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার উপর ভিত্তি করিয়া মানুষের অধিকারাবলী ঘোষিত হইল।

প্যারিসের অধিবাসীরা কিন্তু এই সব সংস্কারের প্রতি আস্থা স্থাপন করিল না। তাহারা খাদ্যের জন্য আন্দোলন শুরু করিল। তাহারা একটি ভূখা মিছিল বাহির করিল। ঐ মিছিল গিয়া রাজাকে এমন কি জাতীয় পরিষদকে পর্যন্ত প্যারিসে আসিতে বাধ্য করিল।

দেড় বৎসর ধরিয়া ফ্রান্সে আর বড় রকমের কোন গোলযোগ হইল না। এই সময় জাতীয় পরিষদ অনেকগুলি ভাল ভাল আইন প্রণয়ন করিল। রাজা কিন্তু মনে-প্রাণে এই সব আইন ভাল ভাবে

গ্রহণ করিতে পারিলেন না। বরং তিনি দেশ হইতে পলাইয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু তাঁহার আশা সফল হইল না। তিনি ধরা পড়িয়া গেলেন এবং বন্দী অবস্থায় প্যারিসে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার এই অবিবেচনার ফলে তাঁহার প্রতি লোকের আস্থা চলিয়া গেল। মধ্যপন্থী নেতাদের প্রভাব পর্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইল। এই সুযোগে চরমপন্থীরা বিপ্লবের অধিনায়ক হইয়া উঠিল।

বিপ্লবের প্রভাব ফ্রান্সের মধ্যে নিবদ্ধ রহিল না, বিদেশেও ছড়াইয়া পড়িল। ইহার ফলে ইউরোপের রাজাদের মনে বড় ভয় হইল। তাঁহারা বুঝিলেন ফরাসী বিপ্লবের জয় হইলে উহার আঘাত তাঁহাদের সিংহাসনের উপরও আসিয়া পড়িবে। সুতরাং তাঁহারা ঐ বিপ্লবের বিরোধী হইয়া উঠিলেন। ফলে ফ্রান্সের সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধের প্রথমদিকে ফরাসীদের পরাজয় হইল। শত্রুসৈন্য তাঁহাদের দেশের দিকে দুর্নিবার বেগে আগাইয়া আসিতে লাগিল।

ফরাসীরা কিন্তু তাহাদের সংকটে উদাসীন রহিল না। তাহাদের অন্তরে দেশরক্ষার দুর্জয় সংকল্প সঞ্চারিত হইল। এই সংকল্প আরও উদ্দাম করিয়া তুলিল একটি নব রচিত সংগীত। ঐ সংগীত আজিও ফ্রান্সের জাতীয় সংগীত হইয়া রহিয়াছে। ঐ সংগীতে আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া চারিদিক হইতে অগণিত স্বেচ্ছাসেবক ফরাসী সীমান্তের দিকে ছুটিয়া চলিল—

'হয়ত ফিরিতে জিনিয়া সমর,
নয়ত মরিয়া হইতে অমর।'

এই সময় ফরাসী রাজার অবস্থা আরও খারাপ হইল। অনেকের মনে হইল দেশের শত্রুদের সহিত তাঁহার সংযোগ আছে। অন্ততঃ প্যারিসের বহু লোকের ঐরূপ মনে হইল। তাহারা স্থির করিল, ঐ সংযোগ ছিন্ন করিতেই হইবে। এই উদ্দেশ্যে তাহারা রাজপ্রসাদ

অবরোধ করিল এবং রাজা ও তাঁহার পরিবারের অন্যান্য লোককে কারাগারে গিয়া বন্দী জীবন যাপন করিতে বাধ্য করিল। রাজা বন্দী হইলে ফ্রান্সে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। পুরাতন জাতীয় পরিষদের পরিবর্তে একটি নূতন পরিষদের নির্বাচন হইল। ফ্রান্সের শাসনভার নূতন পরিষদ গ্রহণ করিল।

বিভীষিকার রাজত্ব ঃ ফ্রান্সের সকল লোকই কিন্তু রাজার বিরোধী ছিল না। দক্ষিণ ও পশ্চিম ফ্রান্সের লোক রাজাকে ভালবাসিত। বিপ্লবীদের কার্যকলাপ দেখিয়া তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না। রাজার অনুকূলে তাহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। ফলে, ফ্রান্সের সংকট আরও জটিল হইয়া উঠিল। বাহির হইতে শত্রুরা কখন ফ্রান্স আক্রমণ করে তাহার স্থিরতা নাই। দেশের মধ্যে বহু লোক থাকিতে পারে যাহারা এই শত্রুদেরই অনুকূলে। তাহার উপর এই প্রকাশ্য বিদ্রোহ। এই অবস্থায় চরমপন্থী ফরাসী নেতারা বিপ্লবের প্রতিকূল সকল সম্ভাবনাকে চূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন। ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হইল, তাহাকে বলা হয় বিভীষিকার রাজত্ব (Reign of terror)।
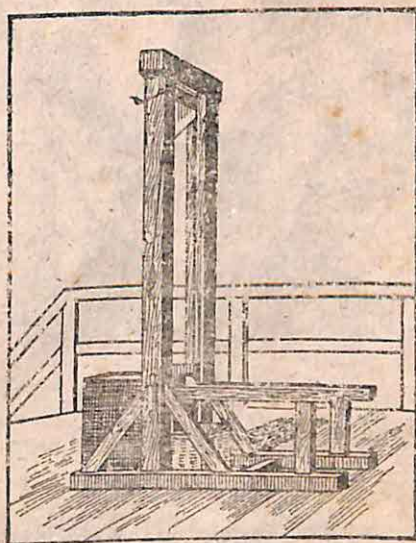
গিলোটিন যন্ত্র

যাহাকে নূতন ফরাসী সরকারের প্রতিকূল বলিয়া মনে হইত,

তাহাকেই বন্দী করা হইত। যাহাকে অভিজাতশ্রেণীর লোক মনে হইত অনেক ক্ষেত্রেই তাহাকে বন্দী করা হইত। এইরূপে হাজার হাজার লোককে বন্দী করা হয়। জনসাধারণের নিরাপত্তা বিধায়িনী সমিতি (Committe of public safety) নামে একটি ছোট প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইল। এই প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে বন্দিগণকে সরাসরিভাবে বিচার করা হইত। যাহা-দিগকে দোষী বলিয়া মনে করা হইত তাহাদিগকে গিলাটিন যন্ত্রের সাহায্যে নিহত করা হইত। হাজার হাজার লোকের এইরূপে জীবনাবসান হইল। রাজা ষোড়শ লুই এবং রানী আঁতোয়ানেত উভয়কেই এইভাবে মৃত্যু বরণ করিতে বাধ্য করা হইল।

রানী আঁতোয়ানেত

তারপর আসিল মধ্য-পন্থীদের পালা। বহু মধ্য-পন্থীনেতা এইভাবে নিহত হইলেন। ফ্রান্সে কাহারও ধনপ্রাণ নিরাপদ রহিল না। শেষে চরমপন্থীরা নিজেদের মধ্যে কলহ আরম্ভ করিল। বিভীষিকার রাজত্বের অধিনায়ক ছিলেন রবস্‌পীয়ার। তিনি তাঁহার সহকারী দাঁতোঁকে

রবস্‌পীয়ার

নিহত করিলেন। শেষে রবস্‌পীয়ারের শত্রুরা তাঁহাকে হত্যা করিল।

চরমপন্থীরা কিন্তু বিভীষিকার আশ্রয় লইয়া ফ্রান্সের অন্তর্বিদ্রোহ দূর করিয়াছিলেন। তাহাদের উদ্যমে ফরাসী সৈন্যবাহিনী শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া স্বদেশকে নির্বিঘ্ন করিয়াছিল। তাহাদের যুদ্ধ পরিচালনার ফলে দেশ নিরাপদ হওয়ায় বিভীষিকার আর প্রয়োজন রহিল না। নিজেদের মধ্যে কলহের ফলে তাহাদের শক্তিও দুর্বল হইয়া পড়িল। এই সুযোগে মধ্যপন্থীরা দেশে আবার প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। কিন্তু ইহারা আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দূর করিতে পারিলেন না। বৈদেশিক ব্যাপারেও ইঁহারা সকল সমস্যার সমাধান করিতে পারিলেন না।

মধ্যপন্থীদের এই অক্ষমতার সুযোগে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট নামে একজন তরুণ প্রতিভাবান সেনানায়ক আপনার প্রভাব সু-প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি ফ্রান্সে শান্তি, শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি ফিরাইয়া আনিলেন এবং প্রায় পনের বৎসর ধরিয়া ইউরোপে ঐ দেশের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন। মধ্যপন্থী নেতাদের উদ্যমের ফলে বিপ্লবের যুগে যে সকল কল্যাণময় সংস্কার সাধিত হইয়াছিল, নেপোলিয়ান সেগুলিকে চিরস্থায়ী করিয়া তোলেন।

নেপোলিয়ান

তাঁহারই প্রয়াসের ফলে সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আইনের চোখে সকলে সমান বিবেচিত হয়। গুণ অনুসারে সকলে উচ্চপদ পাইবার অধিকারী হয়। সকলেই

উচ্চশিক্ষার সুযোগ পায়। সকলেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারী হয়।

নেপোলিয়ানের আবির্ভাবের ফলে ফরসী-বিপ্লবের অবসান হইল। কিন্তু ইহার প্রভাবের অবসান হইল না। ইহার প্রাসাদে ফ্রান্স প্রগতির মহাপীঠে পরিণত হইল। যে সকল অবস্থার ফলে ফরাসী-বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছিল, সেই সকল অবস্থা ইউরোপের অন্যত্রও বিদ্যমান ছিল। সুতরাং ঐ বিপ্লবের আদর্শগুলি দেশদেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ঐ সব দেশের অসংখ্য অধিবাসী তাহাদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবন নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে অধীর হইয়া উঠিল। এইরূপে ফরাসী-বিপ্লবের প্রভাবে উনবিংশ শতকের ইউরোপীয় ইতিহাসের গতি প্রকৃতি গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হইল।

এই সব কারণে ঐ বিপ্লবকে একটি পরম গুরুত্বপূর্ণ যুগরেখা বলা সঙ্গত। ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে স্বেচ্ছাচার, বিভেদ ও বৈষম্যের কণ্টকিত রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থা, আর উহার সম্মুখে দেখা যায় সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শে অনুপ্রাণিত নবীন যুগজীবন।

কালপঞ্জী

খৃঃ ১৭৮৯—'৯৯ ফরাসী-বিপ্লব
খৃঃ ১৭৮৯ স্টেটস্-জেনারেলের অধিবেশন
খৃঃ ১৭৮৯ বাস্তিল দুর্গের পতন
খৃঃ ১৭৯২ ফ্রান্সে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা
খৃঃ ১৭৯৩—'৯৪ বিভীষিকার রাজত্ব
খৃঃ ১৭৯৪—'৯৯ মধ্যপন্থীদের প্রভাবের যুগ
খৃঃ ১৭৯৯—১৮১৫ নেপোলিয়ানের যুগ

অনুশীলনী

১ ফরাসী-বিপ্লবের পূর্বে ফরাসী অভিজাত সম্প্রদায় কি ভাবে জীবন যাপন করিতেন ?

২। ফরাসী-বিপ্লবের পূর্বে ফরাসী জনসাধারণের অবস্থা কিরূপ ছিল ?

৩। কি অবস্থার মধ্যে স্টেট্‌স্ জেনারেল আহূত হয় ? উহার অধিবেশনের কি ফল হয় ?

৪। 'বিভীষিকার রাজত্ব' বলিতে কি বুঝায় ? ফ্রান্সে কি কারণে ঐ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হয় ? উহার ফলই বা কি হয় ?

৫। কি ভাবে নেপোলিয়ান ফরাসী-বিপ্লবের সুফলগুলিকে স্থায়ী-করিয়া তোলেন ?

৬। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় ইতিহাসের উপর ফরাসী-বিপ্লবের প্রভাব বর্ণনা কর।

৭। কি কারণে ফরাসী-বিপ্লবকে একটি গুরুত্বপূর্ণ যুগরেখা বলা যাইতে [illegible]রে ?

৮। ফরাসী-বিপ্লবের জন্য ষোড়শ লুই কতটা দায়ী ছিলেন ?

অষ্টম অধ্যায়

শিল্প বিপ্লব

বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার সর্বপ্রধান উৎস হইতেছে দুইটি বিপ্লব। ইহাদের একটি হইতেছে ফরাসী-বিপ্লব, অপরটির নাম শিল্প-বিপ্লব।

ফরাসী-বিপ্লবের ন্যায় শিল্প-বিপ্লবও আরম্ভ হইয়াছিল খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে। ইংলণ্ডে আরম্ভ হইয়া ঐ বিপ্লব ইউরোপের অন্যান্য দেশে ছড়াইয়া পড়ে। ফরাসী-বিপ্লবের ন্যায় ঐ বিপ্লবও ইউরোপীয় সভ্যতাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। শিল্প-বিপ্লব কিন্তু ফরাসী-বিপ্লবের ন্যায় ঝড়ের বেগে আসে নাই; উহার কাজ চলিয়াছিল নীরবে, একরকম লোকচক্ষুর অন্তরালে।

শিল্প বিপ্লবের স্বরূপ ঃ এককথায় শিল্প-বিপ্লবের পরিচয় দেওয়া কঠিন। আমরা এইটুকু বলিতে পারি পূর্বে মানুষ যে পরিবেশে বাস করিত, যে প্রণালীতে কাজ করিত এবং যেভাবে একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাতায়াত করিত, যে বিপ্লবের ফলে ইহাদের সব কিছুরই পরিবর্তন হয়, তাহাকেই বলা হয় 'শিল্প-বিপ্লব'। সুতরাং ঐ বিপ্লব সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করিতে হইলে উহার পূর্বেকার অবস্থার সহিত পরিচয় থাকা প্রয়োজন।

শিল্প-বিপ্লবের পূর্বে শিল্পদ্রব্য তৈয়ারী হইত শিল্পীর হাতে, অথবা ছোট ছোট অতি প্রাচীন যন্ত্রের সাহায্যে। ঐ সব যন্ত্রের প্রধান উপকরণ ছিল কাঠ। কৃষির কাজও ছিল অনেকটা একই প্রকার। জমির পরিমাণ ছিল ছোট। লাঙ্গল ছিল অতি পুরাতন ধরনের। এই অবস্থার ফলে যাহা উৎপন্ন হইত তাহার পরিমাণ ছিল অত্যন্ত অল্প। উহার জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রমের প্রয়োজন হইত। যে শস্য উৎপন্ন

হইত, যে সকল জিনিসপত্র তৈয়ারী হইত, সেগুলি দূরে লইয়া বিক্রয় করার বিশেষ সুযোগ ছিল না, কারণ খাল ও রাস্তার ভাল ব্যবস্থা ছিল না।

প্রথমে শিল্পীরা ছিল স্বাধীন। তাহারা যে সব জিনিস তৈয়ারী করিত, তাহা তাহারাই বিক্রয় করিত এবং লাভ হইলে ঐ লাভ তাহারা পাইত। পরে নূতন এক শ্রেণীর লোকের আবির্ভাব হয়। ইহারা শিল্পীকে টাকা দিত, কি তৈয়ারী করিতে হইবে তাহারও নির্দেশ দিত। ঐ নির্দেশ অনুসারে তৈয়ারী করা জিনিসগুলি তাহারা বিক্রয় করিত। বিক্রয় করিয়া যাহা লাভ হইত তাহার বেশীর ভাগ তাহারাই আত্মসাৎ করিত। শিল্পীরা ঐ সব মধ্যশ্রেণীর লোকদের উপর ক্রমেই নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। ফলে তাহাদের স্বাধীনতা অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ইংলণ্ডে কতকগুলি যন্ত্রের আবিষ্কার হয়। ঐ সব যন্ত্রের সাহায্যে অনেক অল্প সময়ে এবং অনেক অল্প পরিশ্রমে অনেক বেশী জিনিস তৈয়ারি করা সম্ভব হয়। যন্ত্রগুলি কাঠের পরিবর্তে লোহা দ্বারা নির্মিত হইবার ব্যবস্থা হয়। লোহা গলাইবার জন্য কয়লার ব্যবহার আরম্ভ হয়। কয়লার খনির জল সরাইবার সুব্যবস্থা হয়। উৎপন্ন দ্রব্য স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাইবার জন্য উন্নততর জলপথ ও রাজপথ নির্মিত হয়। যাতায়াত নিরাপদ ও ত্বরান্বিত করা হয়। যন্ত্রের আয়তন ও সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতে থাকে। ঐগুলি কাজে লাগাইবার জন্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কারখানা স্থাপিত হয়। এই সব পরিবর্তনকে একত্রে বলা হয় শিল্প-বিপ্লব।

বহুমূল্যবান যন্ত্র ক্রয় করিয়া, বড় বড় কারখানা স্থাপন করিয়া এবং যাতায়াতের সুব্যবস্থা করিয়া শিল্প-বিপ্লবকে সম্পন্ন করিতে বহু
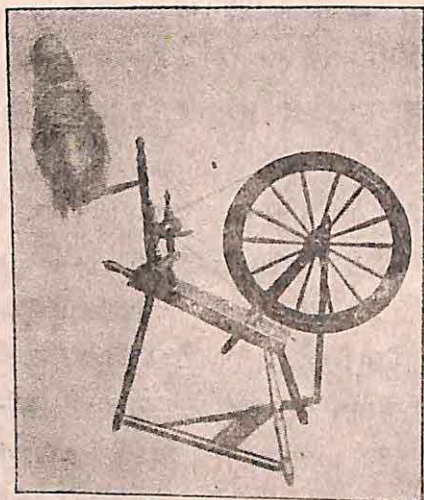
পুরাতন একটি সূতাকাটা যন্ত্র
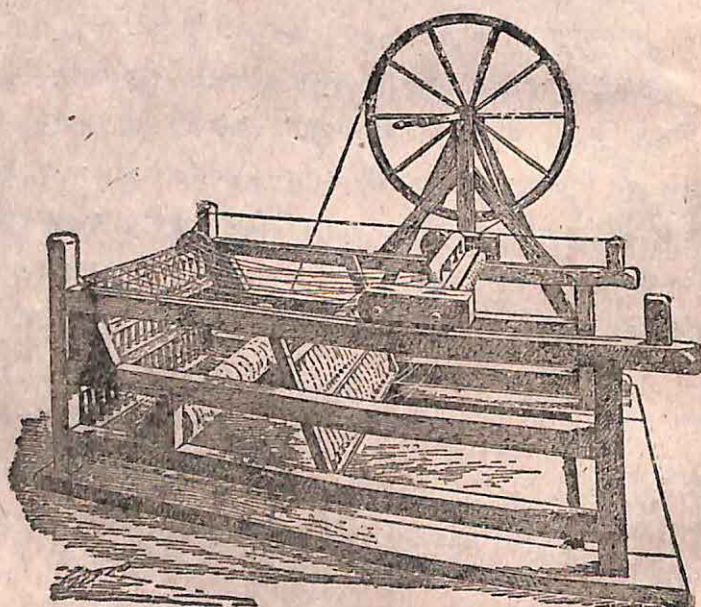
হারগ্রীভ্সের উদ্ভাবিত সূতা কাটার যন্ত্র 'স্পিনিং জেনি'
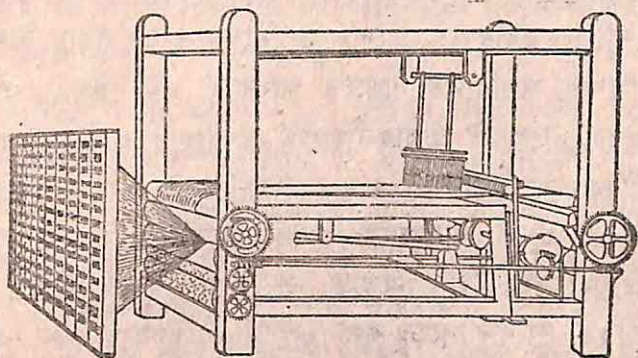
কার্টরাইটের বয়নযন্ত্র
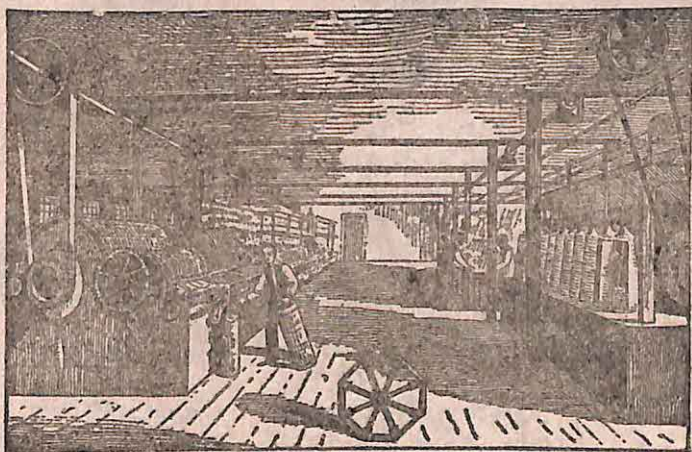
১৭৯০ সালের একটি বস্ত্রবয়ন কারখানা

অর্থের প্রয়োজন হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে বিদেশের সহিত বাণিজ্য করায় এবং বিদেশে উপনিবেশ স্থাপন করায় ইংলণ্ডের বহু পরিবার অপরিমিত ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়াছিল। ঐ সব পরিবারের লোকেরাই প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করে।

বিভিন্ন আবিষ্কার: আমরা শিল্প-বিপ্লবের কথা বলিলাম। এইবার যে সকল আবিষ্কারের ফলে ঐ বিপ্লব সাধিত হইয়াছিল, তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি। প্রথমে আমরা বস্ত্র শিল্পের কথা বলিতেছি। পূর্বে কাপড়ের কল ছিল না। চরকায় সূতা কাটিয়া ঐ সূতা তাঁতে বুনিয়া কাপড় তৈয়ারী হইত। চরকা ও তাঁত ছিল অত্যন্ত অনুন্নত ধরনের। সুতরাং কাপড় তৈয়ারী করিতে বহু পরিশ্রম ও সময়ের প্রয়োজন হইত, উৎপাদনের পরিমাণও হইত নিতান্ত অল্প। এই অবস্থার পরিবর্তন সাধন করেন জন্ কে হারগ্রিভস্, আর্করাইট, ক্রম্পটন, কার্টরাইট এবং জেমস্ ওয়াট।

চরকার প্রথম উন্নতি সাধন করেন হারগ্রিভস্। তাঁহার আবিষ্কৃত স্পিনিং জেনির সাহায্যে একসঙ্গে আটনাল সূতা কাটা সম্ভব হইল। আর্করাইট স্রোতবেগের সাহায্যে সূতা কাটিবার উপায় উদ্ভাবন করেন। তাঁহার যন্ত্রের সাহায্যে পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ বেশী সূতা কাটা সম্ভব হয়।

জেমস্ ওয়াট

এই সময় তাঁতেরও ক্রমোন্নতি হইতে থাকে। এই বিষয়ে প্রথম পথ দেখান জন কে। তাঁহার আবিষ্কৃত তাঁত অপেক্ষাও উন্নততর তাঁত উদ্ভাবন করেন ক্রম্পটন। কার্টরাইট

কলের তাঁত আবিষ্কার করেন। **জেমস্ ওয়াট** কয়লার খনির জল সরাইবার জন্য বাষ্পচালিত যন্ত্রের আবিষ্কার করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে, তাঁত শিল্পে বাষ্পচালিত যন্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ হয়। ফলে, কাপড়ের কলের প্রচলন হয়। কয়লার সাহায্যে লৌহ গালাইবার সুব্যবস্থা হওয়ায় বড় বড় লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা স্থাপন করা সম্ভব হয়। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষের ব্যবস্থা হয়। চাষের উন্নততর যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়। ম্যাকাড্যাম নামক একজন ইঞ্জিনিয়ারের চেষ্টার ফলে রাস্তা পাকা করিবার উপায় উদ্ভাবিত হয়।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে **জর্জ স্টিফেনসন** নামক একজন মনীষী রেলের ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন। ইহার পনের বৎসর পরে ইংলণ্ডে প্রথম রেলগাড়ির

স্টিফেনশন
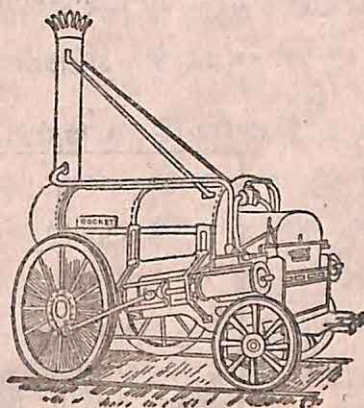
স্টিফেনসনের বাষ্পচালিত
রেল ইঞ্জিন

প্রবর্তন হয়। প্রায় এই সময়েই বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের (কলের) সাহায্যে জাহাজ চালাইবার ব্যবস্থা হয়।

শিল্প বিপ্লবের ফল ঃ শিল্প-বিপ্লবের ফলে কারখানার যুগ আরম্ভ হয়। কারখানায় পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ অধিক জিনিসপত্র তৈয়ারী হইতে থাকে। এই সব জিনিস দেশের বিভিন্ন অংশে, এমন কি বিদেশেও
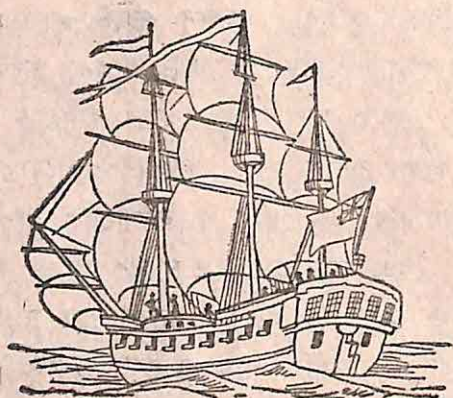
পালতোলা জাহাজ
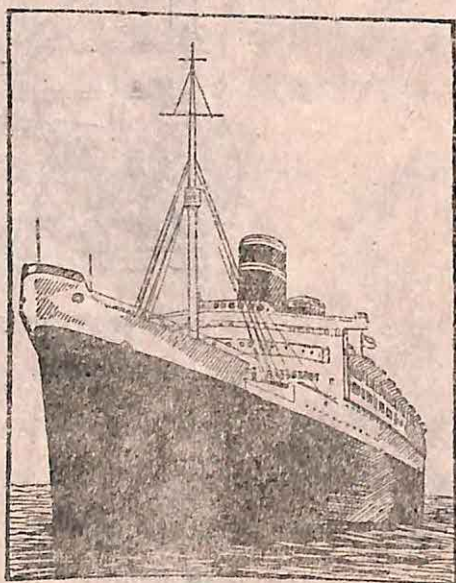
আধুনিক বাষ্পচালিত জাহাজ

চালান দেওয়া সহজ হয়। ফলে, বাণিজ্যের গতি ও পরিধি বহু পরিমাণে বাড়িয়া যায়। বাণিজ্যের উন্নতির ফলে অজস্র অর্থের সমাগম হয়। এই অর্থের বেশীর ভাগ কিন্তু গিয়া পড়ে কারখানার মালিকদের হাতে। অর্থবলে সমাজে ইহাদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়, ইহাদের জীবনের মান উন্নততর হয়। এই কারণে ইহারা শিল্প-বিপ্লবকে আশীর্বাদের উৎস বলিয়া প্রচার করিতে থাকে।

বহু লোকের নিকটকিন্তু শিল্প-বিপ্লব বহন করিয়া আনে আশীর্বাদের পরিবর্তে অভিসম্পাত। ঐ বিপ্লবের পূর্বে অধিকাংশ কৃষক ও শিল্পী বাস করিত গ্রামে। তাহারা ছোট ছোট জমি চাষ করিত, অথবা নিজ নিজ কুটীরে থাকিয়া জিনিসপত্র তৈয়ারী করিত। শিল্প-বিপ্লবের ফলে উভয় শ্রেণীর লোকের জীবনযাত্রার পরিবর্তন হয়।

বড়লোকেরা অনেক জমি কিনিয়া এবং ঐ জমিতে উন্নত ধরনের লাঙ্গল ব্যবহার করিয়া কম খরচে অনেক বেশী শস্য উৎপন্ন করিতে এবং ঐ শস্য অনেক কম দামে বিক্রয় করিতে পারিত। ছোট কৃষকেরা ইহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিত না। টাকার অভাবে তাহারা উন্নততর লাঙ্গল ক্রয় করিতে পারিত না। জমি ছোট হওয়ায় তাহাদের শস্য উৎপন্ন করিতে খরচও বেশী পড়িত। সুতরাং তাহারা তাহাদের জমি বিক্রয় করিয়া কারখানায় কাজ লইল।

যাহারা কুটীর-শিল্পে নিযুক্ত ছিল, শিল্প-বিপ্লবের পূর্বেই তাহাদের অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়। কিন্তু তাহাদের এভাবে থাকাও সম্ভব হয় না। বড় বড় কারখানার সহিত প্রতিযোগিতা করা তাহাদের অনেকের পক্ষেই অসম্ভব হইয়া উঠে। শেষে তাহারা কারখানার চাকরী লইয়া অধীন শ্রমিক মাত্র হইয়া যায়।

কৃষক ও শ্রমিকদের কারখানায় যোগ দেওয়ার ফলে ইংলণ্ডের গ্রামাঞ্চলগুলি লোকবিরল হইল এবং কারখানাগুলিকে কেন্দ্র করিয়া বহুজনপূর্ণ নগর গড়িয়া উঠিল। কিন্তু যাহারা কারখানায় আসিয়া কাজ লইল, তাহাদের কপালে সুখ হইল না। পূর্বে তাহারা খুসীমত কাজ করিত, ভাল না লাগিলে কিছু কালের জন্য কাজ বন্ধ রাখিতে পারিত। এখন তাহাদের রুটিন মত কাজ করিতে হইত।

পূর্বে তাহারা সম্পূর্ণরূপে একটি কাজ করিতে পারিত। কৃষক বীজ বুনিত, শস্য রক্ষা করিত, তারপর উহা পাকিলে ঘরে লইয়া যাইত। তাঁতী সূতা কাটিত, তারপর ঐ সূতা তাঁতে বুনিয়া কাপড় তৈয়ারী করিত। সুতরাং তাহাদের কাজের মধ্যে বৈচিত্র্য ছিল, আনন্দ ছিল। কিন্তু কারখানায় যে সূতা কাটিত, সে সূতাই কাটিত। ফলে তাহার কাজ হইয়া পড়িত একঘেঁয়ে। ঐ কাজ করিয়া তাহার মনে আনন্দ হইত না, হইত ক্লান্তি।

পূর্বে গ্রামে কৃষক ও শিল্পীরা আলো পাইত, হাওয়া পাইত, প্রকৃতির সঙ্গ পাইত, পারিবারিক জীবনের আনন্দ পাইত। পাখীর ডাকের মধ্যেই তাহাদের প্রভাত হইত, শিশুর কলধ্বনির মধ্যে তাহাদের কাজ শেষ হইত। কারখানায় কাজ লওয়ার ফলে তাহাদের আর এই সুযোগ রহিল না। তাহাদিগকে বাস করিতে হইত আলোহাওয়াহীন অস্বাস্থ্যকর বস্তির মধ্যে। তাহাদিগকে ঘিরিয়া থাকিত অন্তহীন কাজ। এই কাজের বিনিময়ে তাহারা যে মাহিনা পাইত তাহাতে তাহাদের কোনক্রমেই দিন চলিত না। তাই তাহাদের পরিবারের সকলকেই কাজ করিতে হইত। রাত্রি শেষ হইবার পূর্বেই মা ঘুমন্ত শিশুকে লইয়া কাজে যাইত। মায়ের সহিত শিশুকেও কাজ করিতে হইত। গভীর রাতে যখন কাজ শেষ হইত, তখন শিশু ঘুমাইয়া পড়িত ; তাহার ভাল করিয়া খাওয়াও হইত না।

কারখানায় হাজার হাজার লোক কাজ করিত। সুতরাং মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে কোনও সহানুভূতির বন্ধন ছিল না। শ্রমিক ছিল শুধু অর্থোপার্জনের যন্ত্র। সেও যে মানুষ, তাহারও যে সুখদুঃখের অনুভূতি আছে, মালিক এ কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। তাই তাহাকে যতদূর সম্ভব খাটাইয়া লইতে তাহার দ্বিধা হইত না। সামান্য কারণে এমন কি অকারণে তাহাকে কাজ হইতে ছাড়াইয়া দিতেও মালিকের সংকোচ হইত না।

শ্রমিকের এই অবস্থা কিন্তু চিরকাল চলিল না। তাহাদের দুঃখের প্রতি লোকের দৃষ্টি পড়িল। কবিতায়, গল্পে ও প্রবন্ধে তাহাদের দুর্গতির কথা প্রচারিত হইতে লাগিল। ফলে, কারখানা সংস্কারের অনুকূলে আন্দোলন আরম্ভ করিল। শেষে সরকার আইনের সাহায্যে ঐ সংস্কার সাধন করিতে আরম্ভ করিলেন। শিশু ও মেয়েদের খনিতে কাজ করা নিষিদ্ধ হইল। শ্রমিকদের কাজ করিবার সময় কতকটা কমাইয়া দেওয়া হইল। কর্মচারীদের দ্বারা কারখানা পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হইল। পরে সরকার কতকগুলি নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত নিজের হাতে তুলিয়া লইলেন।

আমরা শ্রমিকদের যে সকল দুর্দশার কথা বলিলাম, তাহার জন্য কিন্তু শিল্প-বিপ্লব দায়ী নহে, দায়ী হইতেছে এক শ্রেণীর লোকের অপরিসীম অর্থলোভ। এই অর্থলোভ দূর করিতে পারিলে শিল্প-বিপ্লবের সুফল সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের পক্ষেই কল্যাণময় হইতে পারিত। শিল্প-বিপ্লবের ফলে প্রস্তুতির উপর বহু পরিমাণে মানুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহারা কয়লা, লৌহ, পেট্রল প্রভৃতিকে কাজে লাগাইতে শিখিয়াছে। তাহারা স্রোতের বেগ, বাষ্পের শক্তি এবং বিজলীর গতিকেও নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিয়াছে। বর্তমানে তাহারা আণবিক শক্তির উপরও তাহাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত

করিতেছে। প্রকৃতির উপর মানুষের এই নিয়ন্ত্রণ সকলের কল্যাণে পরিচালিত হইলে শিল্প-বিপ্লবের দ্বারা মানুষের অশেষ উপকার সাধিত হইতে পারে।

কালপঞ্জী

খৃঃ ১৭৩৩ জন কে-র তাঁত
" ১৭৬৪ হারগ্রিভ্‌সের চরকা
" ১৭৬৯ আর্করাইটের চরকা
" ১৭৭৬ ক্রম্পটনের তাঁত
" ১৭৮৫ কার্টরাইটের তাঁত
" ১৭৬৯ জেমস্ ওয়াটের বাষ্পীয় ইঞ্জিন
" ১৮১৪ জর্জ ষ্টিফেনসনের বাষ্পীয় রেলগাড়ী

অনুশীলনী

১। ফরাসী-বিপ্লবের সহিত শিল্প বিপ্লবের তুলনা কর।

২। মানুষ যেভাবে বাস করিত, যেভাবে কাজ করিত এবং যেভাবে একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাতায়াত করিত, শিল্প-বিপ্লবের ফলে সে সবই বদলাইয়া যায়—এইরূপ মনে করিবার কি কারণ আছে?

৩। শিল্প-বিপ্লবের ফলে শিল্পীর অবস্থার কি পরিবর্তন হয়?

৩। কারখানার যুগ আরম্ভ হইবার পূর্বেই শিল্পী কিভাবে পরনির্ভরশীল হইয়া পড়িতেছিল?

৫। শিল্প-বিল্পবের ফলে ইংলণ্ডের কৃষিব্যবস্থার এবং কৃষিজীবীদের অবস্থার কি পরিবর্তন হয়?

৬। কোন্ শ্রেণীর লোকেরা এবং কি কারণে শিল্প-বিপ্লবকে আশীর্বাদের উৎস বলিয়া মনে করিত?

৭। যে সকল কৃষক ও শিল্পী কারখানায় কাজ লইত, তাহাদের জীবন কেন সুখময় হয় নাই?

৮। শিল্প-বিপ্লব কি সত্য সত্যই মানুষের নিকট অভিসম্পাত বহন করিয়া আনিয়াছে? ইহা কি কোনক্রমেই মানুষের মঙ্গলের নিদান হইতে পারে না?

নবম অধ্যায়

ইটালি ও জার্মানীতে রাষ্ট্রীয় একতার প্রতিষ্ঠা

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি ফরাসী-বিপ্লবের প্রভাবে পরবর্তী ইউরোপের ইতিহাস গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। এই অধ্যায়ে আমরা দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ফরাসী-বিপ্লব যে সকল আদর্শকে লোকপ্রিয় করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একটি হইতেছে—সকল জাতিরই স্বাধীনতা লাভের অধিকার। এই আদর্শের প্রেরণায় বর্তমান ইউরোপের দুইটি প্রধান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। উহারা হইল ইটালী ও জার্মানী। উভই দেশই ছিল অনেকগুলি রাজ্যে বিভক্ত। উভয় দেশেই একতা ও স্বাধীনতার প্রেরণা আসিয়াছিল নেপোলিয়ানের বিজয় অভিযানের ফলে।

ইটালী ঃ ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে ইটালীতে কোন একতা ছিল না, ছিল অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্য। ঐ সব রাজ্য ছিল স্বেচ্ছাচারী রাজাদের অধীন। সমাজ ছিল বৈষম্য ও বিভেদে কণ্টকিত। জমিদারদের সুযোগ-সুবিধার অবধি ছিল না। তাহারা অবাধে কৃষকদের উপর নিষ্ঠুর নিপীড়ন চালাইতে পারিত।

এই অবস্থায় নেপোলিয়ান সহজেই ইটালী জয় করিয়া লইলেন। ইটালীর অধিবাসীরা ফরাসী সাম্রাজ্যের অধীন হইল। কিন্তু এই অধীনতার ফলে তাহাদের বিশেষ উপকার হইল। কিন্তু এই নির্দেশে ছোট ছোট রাজ্যগুলি ভাঙ্গিয়া গেল। সমস্ত ইটালীতে একটি সাধারণ শাসন প্রবর্তিত হইল, সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইল। জমিদারদের অত্যাচার দূর হইল, কৃষকদের অবস্থা ভাল হইল। এই শাসনব্যবস্থার ফলে ইটালীর অধিবাসীরা জাতীয় একতার মূল্য বুঝিতে পারিল।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে শত্রুদের হাতে নেপোলিয়ানের পরাজয় হইল। শত্রুরা ভিয়েনা নগরীতে একটি মহাসভার অধিবেশন করিয়া ইউরোপে স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র নিরাপদ করিয়া তুলিবার আয়োজন করিল। ঐ মহাসভার নির্দেশে ইটালীকে আবার ছোট ছোট রাজ্যে ভাগ করা হইল। পলায়িত রাজারা আবার ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে ফিরিয়া আসিল অভিজাতদের বিশেষ অধিকার, জমিদারদের অত্যাচার এবং কৃষকদের দুঃখ ও দুর্দশা। ইটালীর অখণ্ডতা পর্যন্ত বিনষ্ট করা হইল। উহার দুইটি অঞ্চল লম্বার্ডি ও ভেনিস অস্ট্রিয়া নামক জার্মানীর একটি রাজ্যের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। এইরূপে ইটালীর একতা ও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা হইল।

ইটালীতে কিন্তু একতা ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নির্বাপিত হইল না। কয়েকজন তরুণ দেশভক্ত এই আকাঙ্ক্ষাকে অনির্বাণ রাখিলেন এবং উহাকে ক্রমেই উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিলেন। ইঁহাদের অগ্রণী হইলেন ম্যাটসিনি।

ম্যাটসিনি

ম্যাটসিনি: ম্যাটসিনির জীবনের আদর্শ ছিল—(১) ইটালীকে অস্ট্রিয়া ও অন্যান্য স্বেচ্ছাচারী রাজাদের অধীনতা হইতে মুক্ত করা, (২) উহার সকল অধিবাসীকে একসূত্রে গ্রথিত করা এবং (৩) তাহাদিগকে লইয়া একটি বিশাল গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা। তিনি নব্য ইটালী নামে একটি সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংঘের শিক্ষা ও প্রচারের ফলে ইটালীর অসংখ্য অধিবাসী তাহাদের মাতৃভূমির সেবায় আত্মদান করিতে অধীর হইয়া উঠে।

ইটালীর প্রধান নগরের নাম রোম। রোম ছিল ধর্মগুরু পোপের শাসনাধীন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে রোমের অধিবাসীরা পোপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ম্যাটসিনি এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং একটি গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। ম্যাটসিনির গণতন্ত্র কিন্তু স্থায়ী হয় নাই। ফরাসী দেশের শাসনকর্তা তৃতীয় নেপোলিয়ন ছিলেন পোপের অনুকূল। তিনি ঐ গণতন্ত্রের শত্রু হইলেন। তাঁহার শত্রুতার ফলে উহা ভাঙ্গিয়া গেল। ম্যাটসিনিকে ইংলণ্ডে চলিয়া যাইতে হইল। সুতরাং ম্যাটসিনি তাঁহার স্বপ্ন সফল করিতে পারেন নাই। ইটালীতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা বহুকাল পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই। তবুও ইটালীর মুক্তি আন্দোলনের কথা বলিতে হইলে তাঁহার কথাই প্রথমে বলিতে হয়। তিনিই প্রথমে ইটালীর স্বাধীনতা ও একতার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার দেশবাসীকে ঐ স্বপ্নে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। যাঁহারা ইটালীর স্বাধীনতা আনয়ন করেন তাঁহারা অনেকে তাঁহারই মন্ত্রশিষ্য।

গ্যারীবল্‌ডি

গ্যারীবল্‌ডি : গ্যারীবল্‌ডি হইলেন ইঁহাদের অন্যতম। তিনি ছিলেন স্বাধীনতা যুদ্ধের নির্ভীক সৈনিক। তাঁহাকে নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে, নির্বাসনে যাইতে হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তিনি দেশ-সেবার আদর্শ হইতে দূরে সরিয়া যান নাই। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে রোমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি ঐ গণতন্ত্র রক্ষা করিতে অগ্রসর

হইলেন। তাঁহার এই প্রয়াস ব্যর্থ হয় এবং তিনি আমেরিকায় চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। কিন্তু কিছুকাল পরে তিনি ইটালীতে আবার ফিরিয়া আসেন।

গ্যারীবল্‌ডির জীবনে প্রধান লক্ষ্য ছিল ইটালীর মুক্তি সাধন করা। যখন তিনি দেখিলেন, ইটালীকে স্বাধীন গণতন্ত্রে পরিণত করা সম্ভব নহে, তখন তিনি সার্ডিনিয়ার মন্ত্রী কাভুরের পক্ষ গ্রহণ করিলেন এবং নিঃস্বার্থভাবে ইটালীর শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিয়া সার্ডিনিয়ার নেতৃত্বে ইটালীর একতা ও স্বাধীনতা লাভে সহায়তা করিলেন।

ইটালীর অন্তর্গত নেপ্‌লস্‌ ও সিসিলিতে বুর্‌বন বংশীয় এক রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার স্বেচ্ছাচারের ফলে তাঁহার প্রজাদের মধ্যে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। গ্যারীবল্‌ডি মাত্র এক হাজার সৈন্য লইয়া সকল বিপদ উপেক্ষা করিয়া বিদ্রোহীদের সহিত যোগ দিলেন এবং তাহাদের আন্দোলনকে জয়যুক্ত করিয়া তুলিলেন। তাঁহার এই কাজের ফলে সিসিলি ও নেপ্‌লস্‌ সার্ডিনিয়া রাজ্যের সহিত মিলিত হইল এবং ইটালীর একতার পথ বহু পরিমাণে প্রশস্ত হইল।

কাভুর

কাভুর ঃ এইবার আমরা কাভুরের কথা বলিতেছি। কাভুর বুঝিয়াছিলেন একমাত্র সার্ডিনিয়ার সাহায্যেই ইটালীকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করা সম্ভব হইবে। সার্ডিনিয়া ছিল ইটালীর রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম, কিন্তু এই রাজ্যটি ছিল অন্যান্য রাজ্য অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। ইহার রাজাও ছিলেন দেশভক্ত। সুতরাং কাভুর সার্ডিনিয়াকে আপনার

কর্মক্ষেত্র করিলেন। তিনি ইহার অধিবাসিগণকে প্রগতিশীল করিলেন। ইহার শক্তিকেও তিনি বাড়াইয়া তুলিলেন। তিনি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে প্রচার কার্য চালাইয়া ইটালীর মুক্তি আন্দোলনের প্রতি ঐ দুই দেশের অধিবাসিগণকে সহানুভূতিশীল করিয়া তুলিলেন। কিছুকাল পরে তিনি তৃতীয় নেপোলিয়ানের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন এবং অস্ট্রিয়ার হাত হইতে লম্বার্ডি কাড়িয়া লইলেন।

অস্ট্রিয়ার পরাজয়ের ফলে ইটালীতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা অদম্য হইয়া উঠিল। বহু রাজ্যের অধিবাসীরা তাহাদের রাজাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া সার্ডিনিয়ার সহিত একত্রিত হইল। কেবলমাত্র দুইটি জনপদ পরাধীন রহিল। ইহারা হইল ভেনিস ও রোম। ভেনিসে অস্ট্রিয়ার এবং রোমে পোপের শাসন চলিতে লাগিল।

কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই অস্ট্রিয়ার সহিত প্রাশিয়ার যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সার্ডিনিয়া ঐ যুদ্ধে প্রাশিয়ার সহায়তা করে এবং ঐ সহায়তার মূল্য স্বরূপ ভেনিস লাভ করে। আরও কিছুকাল পরে প্রাশিয়ার সহিত ফ্রান্সের যুদ্ধ হয়। সার্ডিনিয়া ঐ যুদ্ধের সুযোগে পোপের নিকট হইতে রোম কাড়িয়া লয়। এইরূপে সার্ডিনিয়ার নেতৃত্বে ইটালী তাহার একতা ও স্বাধীনতা লাভ করে এবং একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়। সার্ডিনিয়ার রাজা এই রাজ্যের অধিপতির পদ লাভ করেন।

জার্মানী : ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে জার্মানীও ছিল ইটালীর ন্যায় ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত, ঐ রাজ্যগুলিও ছিল স্বেচ্ছাচারী শাসন কর্তাদের অধীন। ইটালীর ন্যায় জার্মানীতেও ছিল অভিজাতদের বিশেষ অধিকার এবং জমিদারদের অত্যাচার। নেপোলিয়ান ইটালীর ন্যায় জার্মানীও জয় করিয়া লন। তাঁহার এই জয়ের ফলে জার্মানীর অধিবাসীরা রাজনৈতিক একতা ও সামাজিক সাম্য লাভ করে।

কিন্তু ইহাতেও তাহারা তৃপ্ত হয় না। তাহারা তাহাদের হারানো স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইবার জন্য অধীর হইয়া উঠে।

পূর্বে বলিয়াছি প্রায় পনের বৎসর পর্যন্ত নেপোলিয়ান ইউরোপের এক বিশাল অংশে আপনার প্রাধান্য অব্যাহত রাখেন। কিন্তু তাঁহার এই প্রাধান্যের বিরুদ্ধে বহুদেশে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। জার্মানরা এই বিদ্রোহে যোগ দিয়া নেপোলিয়ানের পতনের সহায়তা করে।

ভিয়েনার মহাসভায় কিন্তু তাহাদের দেশকে আবার ছোট ছোট রাষ্ট্রে বিভক্ত করা হয়। তাহাদের রাজনৈতিক শাসনে স্বেচ্ছাচার এবং সামাজিক জীবনে বিভেদ ও বৈষম্য ফিরাইয়া আনা হয়। এই খণ্ডচ্ছিন্ন জার্মানীর উপরে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়। অস্ট্রিয়ার সরকার ছিল একান্তভাবে প্রগতি-বিরোধী। সুতরাং বহুবৎসর ধরিয়া জার্মানীতে একতা ও স্বাধীনতার সকল আন্দোলনকে নির্মমভাবে নিপীড়িত করা হয়।

তবুও ঐ আন্দোলনের মৃত্যু হইল না। শত শত দেশভক্তের রক্তে সিক্ত হইয়া ক্রমেই প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর সর্বত্র প্রকাশ্য বিদ্রোহ দেখা দিল। এই বিদ্রোহ এত ভয়াবহ হইল যে অনেকেরই মনে হইল, স্বেচ্ছাচারী রাজাদের শাসন জার্মানীতে আর চলিবে না। কিন্তু এই আশা সফল হইল না। দেশভক্তদের শেষ পর্যন্ত পরাজয় হইল। স্বেচ্ছাচারী শাসনকর্তাদের প্রভুত্ব দৃঢ়তর হইল। দেশ আবার নির্যাতনের অন্ধকারে ভরিয়া গেল। অন্ধকার কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হইল না। যিনি ঐ অন্ধকার দূর করিয়া জার্মানীতে সুপ্রভাত আনয়ন করেন তাঁহার নাম বিসমার্ক।

বিস্‌মার্ক: বিস্‌মার্ক ছিলেন প্রাশিয়া নামক জার্মানীর একটি রাজ্যের অধিবাসী। এক অভিজাত বংশে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল।

তিনি প্রাশিয়ার রাজ-সরকারে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সব কারণে জনসাধারণের আন্দোলনের সহিত তাঁহার সহানুভূতি ছিল না। তিনি জার্মানীর মিলন কামনা করিতেন। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করিতেন, কেবলমাত্র প্রাশিয়ার রাজশক্তির নেতৃত্বে ঐ মিলন সম্ভব হইতে পারে। তিনি আরও জানিতেন, অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্স জার্মানীর মিলন সহ্য করিবে না। কারণ ঐ মিলন সাধিত হইলে জার্মানী উহাদের অপেক্ষা শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। সুতরাং তিনি প্রাশিয়ার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিলেন, তারপর প্রথমে অস্ট্রিয়া এবং পরে ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধের আয়োজন করিলেন।

বিস্‌মার্ক

অস্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিবার পূর্বে তিনি উহাকে বন্ধুহীন করিতে যত্নশীল হইলেন। তিনি রাশিয়ার সহিত মিত্রতা করিলেন, ভেনিস দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া সার্ডিনিয়ার সহায়তা লাভ করিলেন এবং রাইন নদীর তীরবর্তী একটি অঞ্চল ফ্রান্সকে ছাড়িয়া দিবার কথা দিয়া তৃতীয় নেপোলিয়ানকে যুদ্ধ হইতে সরাইয়া রাখিলেন। এইরূপে অস্ট্রিয়াকে বন্ধুহীন করিয়া তিনি তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পরাজয় হইল। ঐ পরাজয়ের ফলে উত্তর জার্মানীর রাজ্যগুলি লইয়া একটি রাজনৈতিক সংঘ গঠিত হইল। প্রাশিয়ার রাজা এই সংঘের অধিনায়ক হইলেন। এই সংঘে অস্ট্রিয়ার স্থান হইল না।

এখনও জার্মানীর মিলন সম্পূর্ণ হইল না। দক্ষিণাঞ্চলে কয়েকটি রাজ্য স্বাধীন রহিয়া গেল। বিস্‌মার্ক জানিতেন, ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ানকে পরাজিত করিতে না পারিলে ঐ রাজ্যগুলিকে প্রাশিয়ার শাসনাধীন করা যাইবে না। সুতরাং তিনি ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তিনি রাশিয়াকে অন্যত্র সুবিধা দিয়া তাহার নিরপেক্ষতা লাভ করিলেন। তিনি দক্ষিণ জার্মানীতে ফ্রান্স বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। তারপর সময় বুঝিয়া তাঁহার অজেয় বাহিনীকে ফ্রান্স আক্রমণ করিবার নির্দেশ দিলেন। তৃতীয় নেপোলিয়ান যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, ফলে তাঁহার পরাজয় হইল।

ফ্রান্স ছিল জার্মানীর শত্রু। উহার পরাজয়ের ফলে সকল জার্মান গর্বে ও আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। এই উচ্ছ্বাসের মুখে সকল আঞ্চলিক বিভেদ দূর হইয়া গেল। দক্ষিণ জার্মানীর অধিবাসীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উত্তর জার্মান সংঘে যোগ দিল। এইরূপে জার্মানী একতা লাভ করিয়া একটি বিশাল শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত হইল। এই সাম্রাজ্যের আধিপত্য লাভ করিলেন প্রাশিয়ার রাজা।

কালপঞ্জী

খৃঃ ১৮১৫ ভিয়েনার রাষ্ট্রব্যবস্থা
খৃঃ ১৮৪৮ রোমে অস্থায়ী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা
খৃঃ ১৮৫৮ কাভুরের তৃতীয় নেপোলিয়ানের সহিত মিত্রতা
খৃঃ ১৮৫৯ ইটালীর লম্বার্ডি লাভ
খৃঃ ১৮৬৬ ইটালীর ভেনিস লাভ
খৃঃ ১৮৭০ ইটালীর রোম লাভ

খৃঃ ১৮৪৮ জার্মানীতে বিফল বিপ্লব

খৃঃ ১৮৬২ বিসমার্কের প্রধানমন্ত্রী (Minister President) পদ লাভ

খৃঃ ১৮৬৬ উত্তর জার্মান সংঘ প্রতিষ্ঠা

খৃঃ ১৮৭১ জার্মানীর মিলন

অনুশীলনী

১। নেপোলিয়ান কি ভাবে ইটালী ও জার্মানীতে একতা প্রতিষ্ঠার সহায়তা করেন ?

২ ইটালীর স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় ম্যাটসিনি ও গ্যারীবল্‌ডির অবদান বর্ণনা কর।

৩। কাভুরের কি আদর্শ ছিল ? ঐ আদর্শ কি ভাবে সফল হয় ?

৪। ইটালীর একতা ও স্বাধীনতা লাভের পথে কি কি অন্তরায় ছিল ?

৫। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর অবস্থা কিরূপ ছিল ? কিভাবে ঐ অবস্থার অবসান হয় ?

৬। কি ভাবে বিসমার্ক জার্মানীকে একটি ঐকবদ্ধ মহারাষ্ট্রে পরিণত করেন ?

দশম অধ্যায়

আমেরিকার ক্রীতদাসদের স্বাধীনতা লাভ

আমরা আমেরিকানদের স্বাধীনতা লাভের কথা বলিয়াছি। স্বাধীনতা লাভের পরে তাহারা যে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে তাহারও উল্লেখ করিয়াছি। ঐ স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধি কিন্তু সকল অধিবাসীকেই স্পর্শ করিতে পারে নাই। আমেরিকায় একশ্রেণীর লোক ছিল যাহাদিগকে ঘিরিয়া থাকিত অধীনতার নাগপাশ। শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিবার তাহাদের সুযোগ ছিল না। সুযোগ ছিল শুধু নির্মম নিপীড়ন সহ্য করিবার। ইহারা হইল ক্রীতদাস। আমরা এই হতভাগ্যদের শৃঙ্খলিত জীবনের কথা এবং এই শৃঙ্খল মোচনের কথা বলিতেছি।

দাসপ্রথার প্রাচীন ইতিহাস : দাসপ্রথার আবির্ভাব আমেরিকায় হয় নাই। অতি প্রাচীনকাল হইতে পৃথিবীর বহু দেশে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। সুসভ্য রোমক সাম্রাজ্য পর্যন্ত ইহার কলঙ্ক হইতে মুক্ত ছিল না। ঐ সাম্রাজ্যের অসংখ্য লোক ছিল ক্রীতদাস। ক্রীতদাসেরা বিনা বেতনে সারাদিন পরিশ্রম করিত এবং অসহ্য দুর্ব্যবহার নীরবে সহ্য করিত।

রোমক সাম্রাজ্যের পতনের পর দাসপ্রথা অনেক পরিমাণে ইউরোপ হইতে চলিয়া গেল। কিন্তু যখন ইউরোপীয়েরা নূতন নূতন দেশ আবিষ্কার করিতে এবং বিদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিতে আরম্ভ করিল, তখন ঐ প্রথার প্রচলন আবার আরম্ভ হইল। শুধু প্রচলন আরম্ভ হইল এমন নহে, উহা ক্রমেই ব্যাপক ও বীভৎস হইয়া উঠিতে লাগিল।

দাসপ্রথার পুনরাবির্ভাব : আমেরিকার আবহাওয়া ইউরোপ অপেক্ষা অনেক বেশী গরম। ঐ গরমের মধ্যে তামাক, আখ কিংবা তুলার ক্ষেতে কাজ করিতে ইউরোপীয়দের বড়ই ক্লেশ হইত। তাই ঐ কাজ করিবার জন্য আফ্রিকার উপকূল হইতে দলে দলে নিগ্রো আমদানি করা হইত। যাহারা ঐরূপ করিত, তাহারা প্রচুর অর্থলাভ করিতে পারিত। সুতরাং স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের বহু অধিবাসী এই লাভজনক ব্যবসায়ে যোগ দিল।

দাস শিকার : দাস শিকারীরা দয়ামায়ার ধার ধারিত না। তাহারা নিগ্রোগণকে কখনও কিনিয়া আনিত, কখনও জোর করিয়া বন্দী করিয়া আনিত। এই উদ্দেশ্যে তাহারা নিশীথ রাত্রে নিদ্রামগ্ন গ্রামে হানা দিতেও দ্বিধা করিত না। জননীর অশ্রু, শিশুর ক্রন্দন কিছুই তাহাদিগকে বিচলিত করিতে পারিত না। হতভাগ্য নিগ্রো-গণকে স্ত্রীপুরুষ নির্বিচারে জাহাজে আলোবাতাসহীন খোলের মধ্যে বদ্ধ করিয়া তাহারা পরমানন্দে আমেরিকার অভিমুখে রওনা হইত।

আমেরিকায় দাসদের জীবনযাত্রার স্বরূপ : আমেরিকার বাজারে ইহাদিগকে বিক্রয় করা হইত। যে ইহাদিগকে ক্রয় করিত, সেই ইহাদের প্রভু হইত। স্ত্রীপুত্রকন্যা সকলেই তাহার সম্পত্তি হইত। ক্রীতদাসদের দুঃখময় জীবনকথা লইয়া বহু বই লিখিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হইল 'টমকাকার কুটীর' (Uncle Tom's Cabin)।

এই বই পড়িয়া আমরা জানিতে পারি, প্রভু ইচ্ছামত তাহার দাসকে বিক্রয় করিতে পারিত। টমকে তিন তিনবার বিক্রয় করা হয়। মায়ের কোল হইতেও শিশুকে ছিনাইয়া লওয়া হইত। এলিজার শিশুপুত্রকে ঐরূপ করিবার আয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু এলিজা তাহাকে লইয়া পলাইয়া যায় এবং রাত্রির অন্ধকারে বরফের

চাঁই অবলম্বন করিয়া নদী পার হইয়া অনুসরণকারীদের নাগালের বাহিরে চলিয়া যায়। প্রভু দাবী করিত দাসকে নির্বিচারে তাহার কথা শুনিতে হইবে। একটি অসুস্থ মেয়ে যথেষ্ট পরিমাণে তুলা সংগ্রহ করিতে না পারায় টমের তৃতীয় প্রভু লিগ্রি টমকে ঐ মেয়েটিকে নির্মমভাবে প্রহার করিতে আদেশ করে। টম এই আদেশ অমান্য করিলে তাহাকে প্রহারে জর্জরিত করা হয়। কোন দাস পলাইয়া গেলে তাহাকে গুলী করিয়া পর্যন্ত মারা হইত। লিগ্রির দুই জন দাসী পলাইয়া গেলে সে অনুসরণকারিগণকে তাহাদের উপর গুলী চালাইবার আদেশ দেয়।

প্রভু তাহার দাসকে ইচ্ছামত প্রহার করিতে পারিত। প্রহারের ফলে তাহার মৃত্যু হইলেও প্রভুর কোনও অপরাধ হইত না। লিগ্রির ও তাহার অনুচরদের প্রহারের ফলে টমের মৃত্যু হয়। কিন্তু এইজন্য লিগ্রিকে কোন শাস্তি পাইতে হয় নাই।

দাসমুক্তি আন্দোলন ঃ আমরা উপরে যাহা বলিয়াছি তাহা হইতে তোমরা বুঝিতে পারিবে দাসপ্রথা কত বড় অন্যায়। যাহা অন্যায় তাহা চিরস্থায়ী হইতে পারে না, ঐ প্রথাও হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কয়েকজন ইউরোপীয় নেতা মানুষের দুঃখ দূর করিতে আগ্রহশীল হইয়া উঠেন। দাসপ্রথার বিরুদ্ধেও আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই আন্দোলনের ফলে প্রথমে ইংলণ্ডে, পরে ইউরোপের অন্যান্য দেশে দাসব্যবসা এবং দাসপ্রথা নিষিদ্ধ হয়।

আমেরিকাতেও ঐ প্রথা দুর্বল হইয়া পড়ে। কিন্তু এই সময় তুলার চাষের জন্য একটি নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার হয়। ফলে তুলার চাষের ব্যাপক প্রসার হয় এবং ক্রীতদাসের চাহিদা বহুগুণে বাড়িয়া যায়। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলের লোকরা দাসপ্রথা রক্ষা করিতে পূর্বাপেক্ষা অধিক আগ্রহশীল হইয়া উঠে।
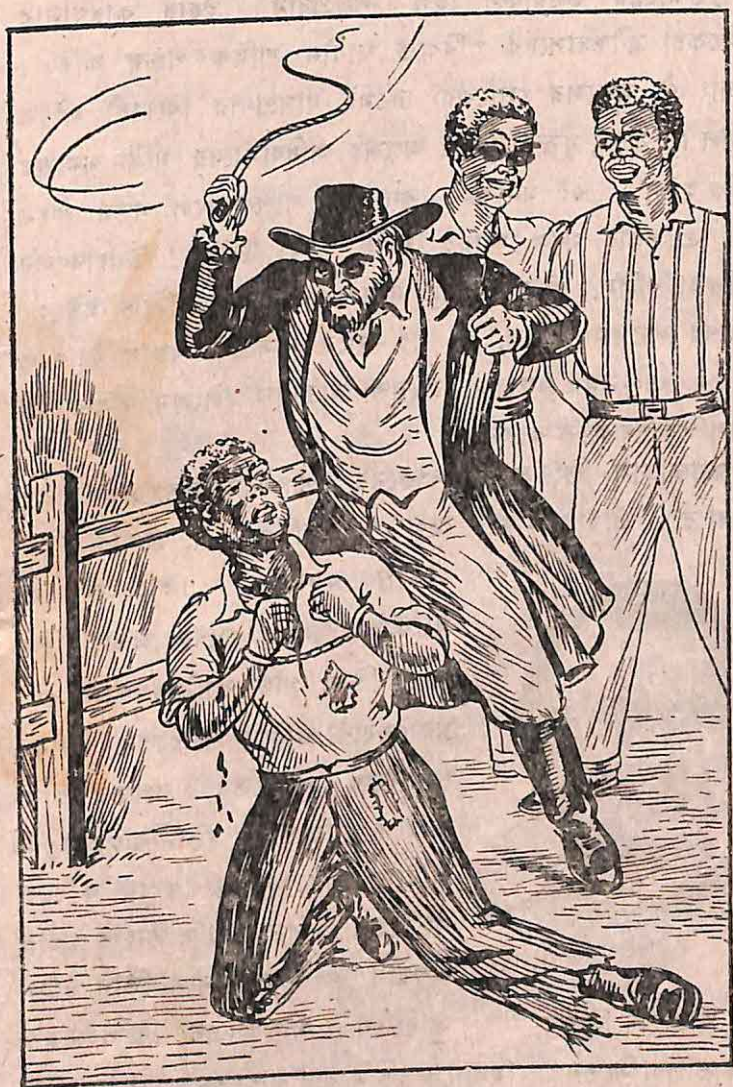
দাসদিগের প্রতি অত্যাচারের দৃশ্য

টমকাকার কুটীর

যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চল ছিল শিল্পপ্রধান। ইহার কারখানার মালিকেরা ক্রীতদাসদের পরিবর্তে স্বাধীন শ্রমিক পছন্দ করিত। সুতরাং ঐ অঞ্চলের লোকেরা ক্রমেই দাসপ্রথার বিরোধী হইতে লাগিল। ফলে, যুক্তরাষ্ট্রে দুই অংশের অধিবাসীদের মধ্যে মনান্তর আরম্ভ হইল। এই মনান্তর যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলে নূতন নূতন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ফলে আরও জটিল হইয়া উঠিল। উত্তরাঞ্চলের লোকেরা বলিল, ঐ সব রাষ্ট্রে দাসপ্রথা নিষিদ্ধ করিতে হইবে। দক্ষিণের লোকেরা বলিল, ঐ সব স্থানে দাসপ্রথা বজায় রাখিতে হইবে। এই সময় উত্তরাঞ্চলের নেতা আব্রাহাম লিংকন যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতির পদ লাভ করেন।

আব্রাহাম লিংকন ঃ লিংকনের জন্ম হইয়াছিল এক দরিদ্র পরিবারে। তাঁহার আকৃতি ছিল অস্বাভাবিক দীর্ঘ, চেহারা ছিল একান্ত কদাকার। কিন্তু রূপ না থাকিলেও তাঁহার গুণের অভাব ছিল না; তিনি গাছ কাটিতে পারিতেন, ঘর তৈয়ারী করিতে পারিতেন, নৌকা চালাইতে পারিতেন, ক্ষেতের কাজ করিতে পারিতেন। তিনি ব্যঙ্গকৌতুক করিতে পারিতেন, গল্প তৈয়ার করিতে পারিতেন। বিদ্যার প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। ভগবানকে তিনি ভক্তি করিতেন। মানুষ, এমন কি পশুকেও তিনি ভালবাসিতেন। মিথ্যাকে তিনি ঘৃণা করিতেন। কোন কাজ আরম্ভ করিলে তিনি উহা না করিয়া ছাড়িতেন না। দেশের সকল অধিবাসীর কল্যাণ সাধন করা এবং রাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষা করাই ছিল

আব্রাহাম লিংকন

তাঁহার জীবনের লক্ষ্য। এইজন্য যুদ্ধ করিতেও তিনি দ্বিধা করিতেন না। কিন্তু শত্রুর প্রতি তিনি বিদ্বেষ পোষণ করিতেন না। তিনি অকপটভাবে তাহাদিগকে ক্ষমা করিতেন।

দুঃখের বিষয় এই মহাপুরুষের সভাপতির পদ লাভের পরেই যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইল। দক্ষিণের লোকেরা মনে করিল, এইবার দাসপ্রথা আইন করিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। এই সম্ভাবনা নিবারণ করিবার জন্য তাহারা যুক্তরাষ্ট্র হইতে সরিয়া গিয়া নূতন একটি সংঘ গঠনে উদ্যোগী হইল। লিংকন এই উদ্যোগে বাধা দিলেন। ফলে, যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের মধ্যে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইল। গৃহযুদ্ধ চলিবার সময় লিংকন এক ঘোষণাপত্রের সাহায্যে ক্রীতদাসপ্রথা নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। ফলে, দক্ষিণের বহু ক্রীতদাস উত্তরের সঙ্গে যোগ দিল। ইহাতে দক্ষিণীরা দুর্বল হইয়া পড়িল এবং অল্পকালের মধ্যেই তাহাদের পরাজয় হইল। এইরূপে লিংকনের কাজের ফলে আমেরিকায় ক্রীতদাসপ্রথার অবসান হইল এবং যুক্তরাষ্ট্রের অখণ্ডতা প্রতিষ্ঠিত হইল।

নিগ্রোরা স্বাধীনতা লাভ করিল। ইহাতে তাহাদের অশেষ উপকার হইল। কিন্তু দক্ষিণের বহু লোক সুযোগ পাইলেই তাহাদের উপর নির্যাতন চালাইত। কতকগুলি গুপ্ত সমিতির সাহায্যে ঐ নির্যাতন চালান হইত। ঐ সব গুপ্ত সমিতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা কুখ্যাত হইল Ku Klux Klun (কিউ ক্লাক্স ক্লেইন্)। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায় নাগরিকদের মধ্যে সকল বৈষম্য দূর করিতে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। তবুও আমেরিকার কোন কোন অঞ্চলে এখনও কৃষ্ণকায় লোকদিগকে অপমান সহ্য করিতে হয়।

গৃহযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র
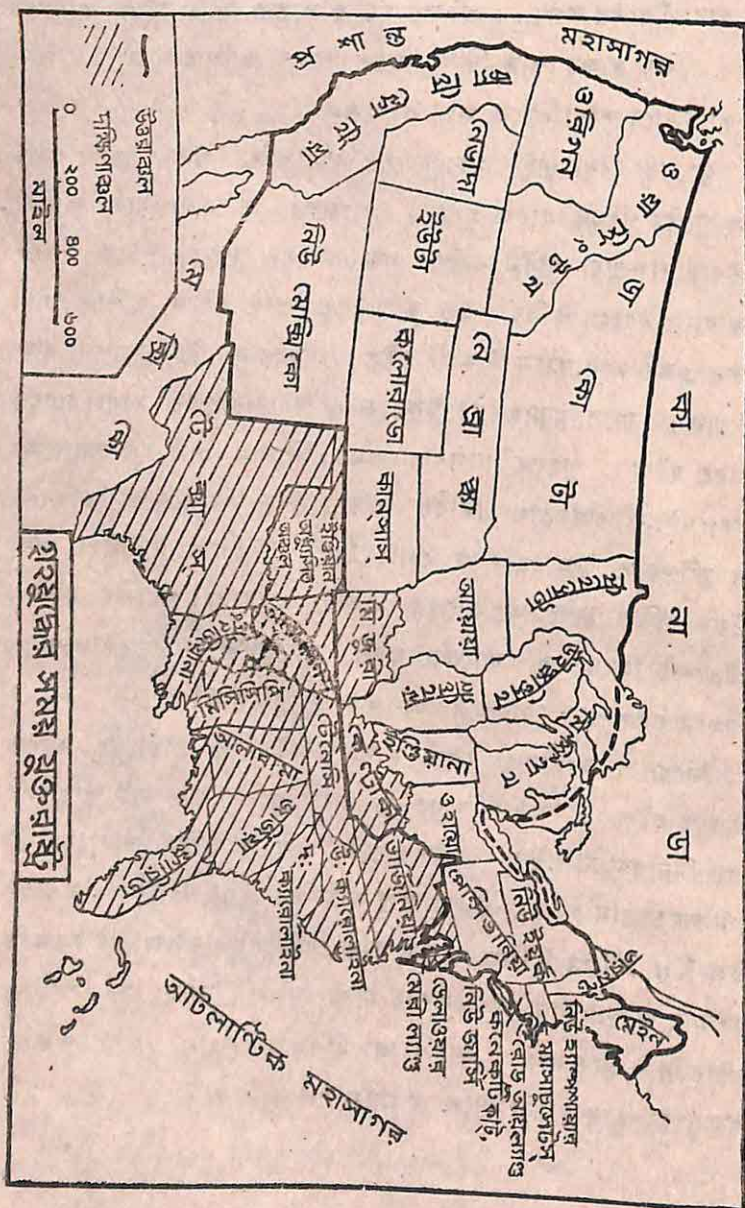
কালপঞ্জী

খৃঃ ১৮৬১	আব্রাহাম লিংকনের নির্বাচন
খৃঃ ১৮৬১	গৃহযুদ্ধের আরম্ভ
খৃঃ ১৮৬২—৬৪	আব্রাহাম লিংকন কর্তৃক ক্রীতদাসের স্বাধীনতা ঘোষণা
খৃঃ ১৮৬৫	যুদ্ধের অবসান

অনুশীলনী

১। কি ভাবে দাস সংগ্রহ করা হইত এবং কি ভাবে তাহাদিগকে আমেরিকায় চালান দেওয়া হইত ?

২। আমেরিকায় ক্রীতদাসদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হইত ?

৩। কি ভাবে আমেরিকায় ক্রীতদাসদের মুক্তি সাধিত হয় ?

৪। আব্রাহাম লিংকনের গুণাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

একাদশ অধ্যায়

এশিয়া ও আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তার

আমরা বলিয়াছি, অজানা জলপথ আবিষ্কারের যুগেই বিদেশে ইউরোপীয়দের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়। তাহাদের এই উদ্যমের ফলে উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে ইউরোপীয় প্রভুত্ব ও ইউরোপীয় সভ্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এশিয়াতেও তাহাদের তিনটি সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। ইহারা হইল ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্য, ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজ সাম্রাজ্য এবং এশিয়ার উত্তর ও মধ্য রুশ সাম্রাজ্য।

ধনজন পরিপূর্ণ এতগুলি বিস্তীর্ণ অঞ্চল লাভ করিয়াও ইউরোপীয়েরা কিন্তু তৃপ্ত হইল না। নূতন নূতন উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করিয়া বিদেশে তাহাদের অধিকার আরও বাড়াইয়া তুলিতে তাহারা উন্মুখ হইয়া উঠিল। তাহাদের এই আকাঙ্ক্ষা সর্বাপেক্ষা বেশী উদ্দাম হইয়া উঠিল উনবিংশ শতকের শেষের দিকে। কেন এইরূপ হইল তাহা বুঝিতে হইলে আমাদিগকে শিল্প-বিপ্লব সম্বন্ধে আরও কিছু বলিতে হইবে।

শিল্প-বিপ্লবের সহিত উপনিবেশ বিস্তারের সম্পর্ক : বাষ্পচালিত রেলগাড়ি ও বাষ্পচালিত জাহাজের আবিষ্কারের ফলে একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাওয়া অনেক সহজ হইল, পৃথিবীকে পূর্বাপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্রকায় বলিয়া মনে হইল। ফলে, বিদেশে উপনিবেশ স্থাপনের অসুবিধা কমিয়া গেল এবং উহার প্রয়োজন ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল।

শিল্প-বিপ্লবের ফলে যে সকল বড় বড় কারখানা নির্মিত হইল তাহাদের জন্য অনেক কাঁচা মালের প্রয়োজন হইত। এই কাঁচা মাল

অনেক সময়ই আনিতে হইত বিদেশ হইতে। যে দেশে কাঁচা মাল পাওয়া যাইত সেই দেশের লোকেরা ঐ মাল না দিলে কারখানা চলিত না।

কারখানা প্রতিষ্ঠার ফলে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণও বহুগুণ বাড়িয়া গেল। দেশের প্রয়োজন মিটাইয়াও বহুদ্রব্য অবশিষ্ট থাকিত। এই অতিরিক্ত দ্রব্য বিদেশে বিক্রয় করিতে হইত। না করিতে পারিলে দেশে অর্থ আসিত না। যে দেশের কাঁচা মাল পাওয়া যাইত এবং যে দেশে উৎপন্ন পণ্য দ্রব্যের চাহিদা থাকিত, সেই দেশে উপনিবেশ থাকিলে খুব সুবিধা হইত। ঐ দেশের অধিবাসিগণকে কাঁচা মাল সরবরাহ করিতে এবং পণ্য দ্রব্য ক্রয় করিতে বাধ্য করা যাইত। এই সব কারণে ইউরোপীয়গণ বিদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তার করিতে অত আগ্রহশীল হইয়া উঠে।

এই অধিকার বিস্তারের মনোভাবকে বলা হইত সাম্রাজ্যবাদ, কারণ ঐ মনোভাব সফল হইলে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইত। ঐ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হইত উপনিবেশের সাহায্যে। তাই উহাকে বলা হইত ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য।

শ্বেতাঙ্গদের বোঝা : ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের পিছনে থাকিত নিছক স্বার্থপরতা। উহার লক্ষ্য হইল সাম্রাজ্যের অধীন জাতিসমূহের সম্পদ শোষণ করা। এই কাজ যে কত অন্যায়, তাহা বোধ হয় ইউরোপীয়েরাও জানিত। তাই সম্ভবতঃ আপনাদের বিবেক শান্ত করিবার এবং অপরকে ভুলাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে তাহারা একটা বুলির আশ্রয় লইল। তাহারা প্রচার করিতে লাগিল, শ্বেতকায় জাতি অপর সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সুতরাং ঐ সব জাতিকে উন্নত করা, সুসভ্য করা শ্বেতকায় জাতির অপরিহার্য

দায়িত্ব বা বোঝা। এই বোঝা বহন করিবার জন্যই ইউরোপীয়েরা বিদেশে তাহাদের নিয়ন্ত্রণ বিস্তৃত করিতেছে। তাহাদের ঐ দাবীর পিছনে সত্য ছিল না। কিন্তু উহার সাহায্যে তাহারা অনেকের সহানুভূতি ও সহযোগ লাভ করিতে সমর্থ হইয়া তাহাদের স্বার্থ-সিদ্ধির পথ সুগম করিয়া তুলিল।

উনবিংশ শতকের শেষের দিকে আফ্রিকার ও এশিয়ার অনেক অঞ্চলের অধিবাসীরা শিল্প ও সামরিক শক্তিতে ইউরোপীয়দের পিছনে পড়িয়াছিল। সুতরাং ইউরোপীয়েরা ঐ সব অঞ্চলে তাহাদের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপন করিবার সংকল্প করিল এবং ছলে-বলে-কৌশলে ঐ সংকল্পকে সফল করিয়া তুলিল।

আফ্রিকার অভ্যন্তরে অনুসন্ধান: উনবিংশ শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত আফ্রিকা ছিল মোটামুটিভাবে ইউরোপীয়দের লক্ষ্যের বাহিরে। তাহারা উহাকে বলিত অন্ধকারময় মহাদেশ। ঐ মহাদেশের শুধু উপকূলভাগের সহিত তাহারা পরিচিত ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দী শেষ হইবার পূর্বেই তাহারা উহার অভ্যন্তরভাগের সহিত অনেকখানি পরিচয় লাভ করিল। এই পরিচয় সম্ভব হইয়াছিল কয়েকজন দুঃসাহসিক অনুসন্ধানকারীর পরিশ্রমের ফলে। অনুসন্ধান-কারীদের মধ্যে লিভিংস্টোন ও স্ট্যানলীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

লিভিংস্টোন ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী একজন ডাক্তার। তিনি খৃষ্টধর্ম প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করেন এবং বহু বৎসর আফ্রিকায় গিয়া বাস করেন। উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে বিষুবরেখা এবং আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল হইতে ভারত মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত বিশাল অঞ্চলে তিনি বৎসরের পর বৎসর ভ্রমণ করেন। আফ্রিকায় তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তাঁহাকে দুস্তর জলাভূমি ও দুর্গম বনের মধ্যে অসম্ভব ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। একাধিকবার

আফ্রিকায় ইউরোপীয় শক্তিবর্গের উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য বিস্তার
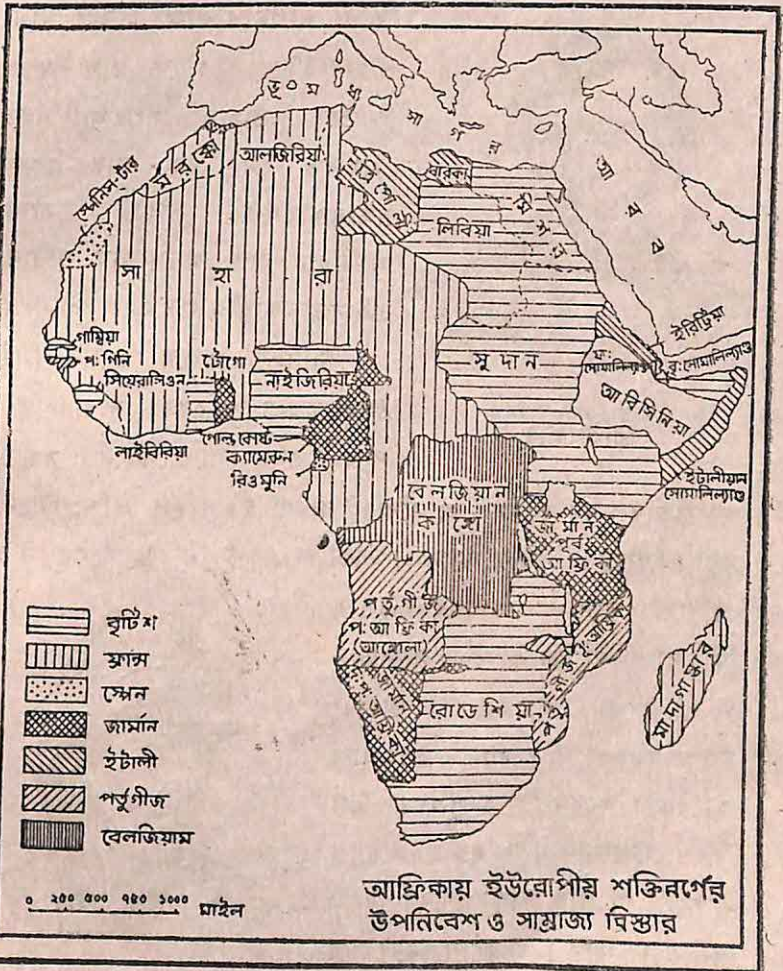
তাঁহার জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হয়। কিন্তু কোন দুঃখ, কোন বিপদই তাঁহার সংকল্প শিথিল করিতে পারে নাই। অবিচল নিষ্ঠার সহিত তিনি আপনার কাজ করিয়া যান। তাঁহার ইউরোপ হইতে দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে তাঁহার অনুরক্ত বন্ধুরা বিচলিত হন এবং আর একজন সন্ধানকারীকে তাঁহার সংবাদ আনিবার জন্য আফ্রিকায় পাঠান। এই সন্ধানকারীর নাম হইল স্ট্যানলী।

লিভিংস্টোন

স্ট্যানলী প্রথমে ছিলেন নিউ-ইয়র্ক হেরল্ড পত্রিকার সংবাদদাতা। পরে তিনি লিভিংস্টোনের সন্ধানে আফ্রিকায় গমন করেন। অনেকেরই ধারণা হইয়াছিল লিভিংস্টোনের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু স্ট্যানলী তাঁহাকে একটি নিবিড় বনের মধ্যে দেখিতে পান। তারপর উভয়ে মিলিয়া আফ্রিকায় অনুসন্ধান চালাইতে থাকেন। তাঁহারা ট্যাঙ্গানিকা হ্রদের উত্তরপ্রান্ত আবিষ্কার করেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে লিভিংস্টোনের মৃত্যু হয়। তবুও স্ট্যানলী তাঁহার অনুসন্ধানের কাজ চালাইয়া যান। কঙ্গো নদী যে পথে সমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছে স্ট্যানলী সেই পথ আবিষ্কার করেন এবং কয়েক বৎসর পরে তিনি স্বাধীন কঙ্গো রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়া

স্ট্যানলী

আফ্রিকা সম্বন্ধে ইউরোপীয়দের অজ্ঞতা অনেক পরিমাণে দূর করেন এবং তাহাদিগকে ঐ মহাদেশে উপনিবেশ স্থাপনে আরও আগ্রহশীল করিয়া তোলেন।

ইউরোপীয়দের আফ্রিকা বিভাগঃ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে উনবিংশ শতকের শেষভাগে আফ্রিকার প্রায় সকল অংশই ইউরোপীয় জাতিদের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সুয়েজ খাল কাটা হয়। এই খালের সাহায্যে ভারত-বর্ষে যাইবার পথ পূর্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত হয়। এই পথ নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড মিশর ও নীল নদের সমস্ত উপত্যকার উপর আপ-নার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। দক্ষিণে একাধিক যুদ্ধের ফলে ইংলণ্ডের অধিকার কেপ কলোনী হইতে বিস্তৃত হইয়া আফ্রিকার প্রায় সমস্ত দক্ষিণ অংশ গ্রাস করে।

ফ্রান্সও একটি বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তোলে। মরোক্কো হইতে টিউনিস পর্যন্ত বিস্তৃত উত্তর উপকূল এবং সাহারা সহ পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল ঐ সাম্রাজ্যের অধীন হয়। জার্মানী পশ্চিম, দক্ষিণ পশ্চিম ও পূর্ব আফ্রিকার বিশাল ভূখণ্ডে আপনার আধিপত্য বিস্তৃত করে। বেলজিয়াম কঙ্গো উপত্যকায় আপনার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। ইটালীও পূর্ব ও উত্তর উপকূলে তিনটি উপনিবেশ স্থাপন করে।

ইউরোপীয়রা আফ্রিকা গ্রাস করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। এশিয়ার অবশিষ্ট অংশেও তাহারা তাহাদের অধিকার বিস্তৃত করিতে থাকে। এ বিষয়ে রাশিয়া অন্যান্য শক্তিকে ছড়াইয়া যায়। সাইবেরিয়া এবং মধ্য এশিয়ার সকল অংশই তাহার অধীন হয়। তাহার সাম্রাজ্যের সীমা প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল হইতে পারশ্য দেশ ও আফগানিস্থানের প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

সুদূর প্রাচ্যে ইউরোপীয়দের প্রভাব ঃ সাম্রাজ্যবাদের নির্মম আঘাতে মহাচীনের অখণ্ডতা পর্যন্ত বিনষ্ট হয়। উহার বিভিন্ন অংশ ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি রাজ্যের প্রভাবাধীন হইয়া পড়ে। ফ্রান্স ইন্দোচীন জয় করে। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলি পর্যন্ত ইউরোপীয়েরা আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইতে উদ্যত হয়।

এই অঞ্চলে নূতন একটি প্রতিদ্বন্দ্বীরও আবির্ভাব হয়। এই প্রতিদ্বন্দ্বীটি হইল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। স্বাধীনতা লাভের ফলে আমেরিকানদের সমৃদ্ধি এবং সমৃদ্ধির ফলে শক্তিলাভ হইয়াছিল। তাহাদের প্রভূত্ব প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। সুতরাং ঐ মহাসাগরের ইউরোপীয়দের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস সে ভাল চোখে দেখিল না। 'হাওয়াই' ও 'ফিলিপাইন' দ্বীপমালা অধিকার করিয়া সে দুর্বাসার মত জানাইয়া দিল অয়ম অহং ভোঃ'—আমি আসিয়াছি। ইউরোপীয়েরা বুঝিল যুক্তরাষ্ট্রকেও লুটের ভাগ দিতে হইবে।

যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরা মূলতঃ ইউরোপীয়দেরই বংশধর। এইদিক দিয়া দেখিলে যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদকে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের সহিত যুক্ত করা বোধ হয় অন্যায় হইবে না। অতএব আমরা বলিতে পারি ইউরোপীয়দের ঔপনিবেশিক প্রয়াসের ফলে পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানেই তাহাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের ফল ঃ এই প্রভুত্ব কিন্তু ইউরোপীয়-দের পক্ষে কল্যাণকর হয় নাই। ইহার ফলে তাহাদের লালসা আরও বাড়িয়া উঠে। এই লালসা বিশেষ করিয়া দেখা দেয় ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, জার্মানী প্রভৃতি দেশের অধিবাসীদের মধ্যে। তাহাদের লক্ষ্য হয় কেমন করিয়া তাহাদের বাণিজ্য আরও বিস্তৃত করিবে, কেমন করিয়া তাহাদের ধনবল আরও প্রবল করিবে। তাহাদেরই এ

লোভের ফলে তাহাদের মধ্যে বিভেদ আরও গভীর এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরও প্রখর হইয়া উঠে। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা তাহাদের অস্ত্রবল বাড়াইয়া তুলিতে এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে জোট সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করে। তাহাদের এই দুর্বুদ্ধির ফলে অল্পকালের মধ্যেই ইউরোপ কতকগুলি সশস্ত্র শিবিরের সমষ্টিতে পরিণত হয়। বিংশ শতাব্দীর শেষে তাহারই রঙ্গমঞ্চ রচিত হয়।

এশিয়ায় কিন্তু ইউরোপীয় শোষণের বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই শোষণের নিষ্ঠুর নিপীড়নে ঐ মহাদেশের বহু অঞ্চলের অধিবাসীদের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। তাহারা তাহাদের স্বদেশের দুঃখ ও দৈন্য অনুভব করিয়া চঞ্চল হইয়া উঠে। তাহারা তাহাদের জন্মভূমিকে ভালবাসিতে শিক্ষা করে। উহার অতীত গৌরবের প্রতি তাহারা শ্রদ্ধাশীল হয়। বিদেশী শাসন ও শোষণ হইতে মুক্ত করিয়া তাহারা আবার তাহাদের প্রিয় জন্মভূমিকে স্বাধীন, সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতির আধার করিয়া তুলিতে অধীর হইয়া উঠে। তাহাদের এই মনোভাবেরই নাম জাতীয়তাবোধ। ইউরোপীয় শাসনের ফলে এশিয়ার বহু অঞ্চলে এই জাতীয়তাবোধ ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠে এবং শেষে ইতিহাসের গতিকে পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করিয়া সমর্থ হয়।

কালপঞ্জী

উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ	ইউরোপীয়দের আফ্রিকা বিভাগ
” ” ”	ইউরোপীয়দের চীনে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার
” ” ”	আমেরিকার ফিলিপাইন অধিকার

অনুশীলনী

১। শিল্প-বিপ্লবের ফলে বিদেশে উপনিবেশ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা কি কারণে বৃদ্ধি পায় ?

২। লিভিংস্টোন ও স্ট্যানলী কি ভাবে আফ্রিকায় ইউরোপীয় উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেন ?

৩। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইউরোপীয়েরা আ ফ্রকায় যে কয়টি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল তাহাদের পরিচয় দাও।

৪। এশিয়ায় ইউরোপীয়দের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যগুলির নাম কর।

৫। শ্বেতাঙ্গদের বোঝা, এই কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য কি ?

৬। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য কাহাকে বলে ? ইহার প্রকৃত লক্ষ্য কি ?

৭। আফ্রিকা ও এশিয়ায় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া ইউ-রোপীয়েরা নিজেদেরও ক্ষতি করিয়াছিল'—এইরূপ মনে করিবার কি কারণ আছে ?

৮। এশিয়ায় ইউরোপীয়দের শাসন ও শোষণের কিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ?

দ্বাদশ অধ্যায়

চীন ও জাপানের নব জাগরণ

ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি কিরূপে এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে তাহাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল তাহা পূর্বে বলিয়াছি। এখন বিশেষ করিয়া চীন ও জাপানে তাহার অনুপ্রবেশের কথা বলিতেছি। এ বিষয়ে ঐ দুইটি দেশের ইতিহাসে অনেকটা মিল লক্ষ্য করা যায়। উভয়েই বহুকাল ধরিয়া ইউরোপীয়দের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিতে সম্মত হয় নাই। অবশেষে চাপে পড়িয়া খৃষ্টীয় উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে তাহারা তাহাদের রুদ্ধদ্বার খুলিতে বাধ্য হয়। ইহার পরে কিন্তু ঐ দুইটি দেশের ইতিহাস বিভিন্ন পথ অনুসরণ করে।

ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ চীনের স্বাধীনতা, এমন কি অখণ্ডতাকে পর্যন্ত বিপন্ন করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু ঐ সাম্রাজ্যবাদের আঘাতে জাপানে এক নব জাগরণের সূচনা হয়। অল্পকালের মধ্যেই জাপান একটি প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্র হইয়া উঠে।

আমরা প্রথমে চীন ও পরে জাপানে ইউরোপীয় প্রভাব এবং উহার প্রতিক্রিয়ার কথা বলিতেছি।

চীন ঃ যাহারা চীনের বিচ্ছিন্নতা ভঙ্গ করে, ইংলণ্ড ছিল তাহাদের অগ্রণী। ইংরেজদের উদ্দেশ্য ছিল ঐ দেশে ব্যবসা করিয়া উহার অর্থ শোষণ করা। যে সকল পণ্যদ্রব্য তাহারা চীনে আমদানি করিতে চাহিত তাহার মধ্যে প্রধান হইল অহিফেন। অহিফেন প্রচলনের ফলে চীনাদের যে কিরূপ সর্বনাশ হইবে, তাহা তাহারা ভাবিয়াও দেখিত না। শাসনকর্তারা কিন্তু এ বিষয়ে উদাসীন থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা ঐ ব্যবসা নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। ইংরেজেরা এই নিষেধ মানিল না, তখন বাধ্য হইয়া একজন চীনা রাজপুরুষ

এশিয়ায় আমেরিকা ও ইউরোপীয় শক্তিবর্গের উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য বিস্তার
রাশিয়া
বৃটিশ (বৃ:)
ডাচ্
ফ্রান্স (ফ:)
পর্তুগীজ (প:)
আমেরিকা (আ:)
মাইল
ইউরোপ
সাইবেরিয়া
মঙ্গোলিয়া
তুরস্ক
সিরিয়া
তুর্কিস্থান
সিনকিয়াং
চীন
পারস্য
আফগানিস্থান
তিব্বত
ভারতবর্ষ
আরব
আফ্রিকা
আরব সাগর
এডেন
সিংহল
শ্যাম
মলয়
বোর্ণিও
জাভা
তিমার
নিউগিনি
ফিলিপাইন দ্বীপ পুঞ্জ (আমেরিকা)
ভারত মহাসাগর
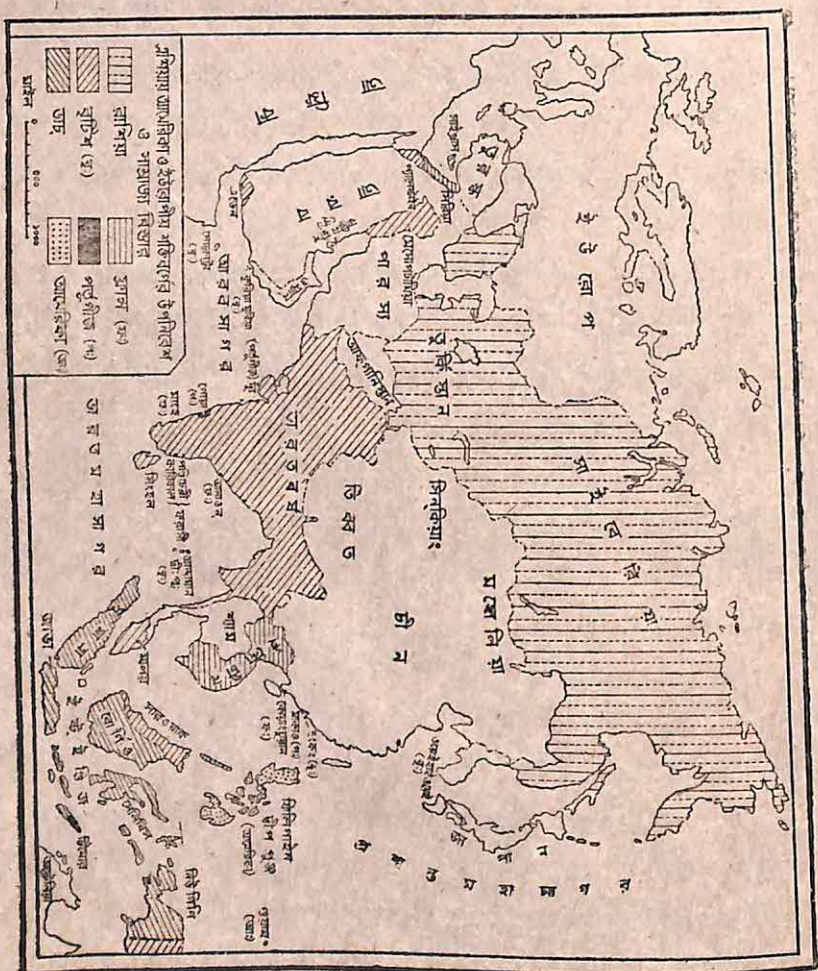
ইংরেজদের নিকট হইতে কুড়ি হাজার অহিফেনের বাক্স কাড়িয়া লইয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিলেন।

তাঁহার এই কাজের ফলে ইংরেজদেই সহিত চীনের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধে চীনাদের পরাজয় হইল। তাহারা ইংরেজদিগকে হংকং ছাড়িয়া দিতে এবং অপর কয়েকটি বন্দরে বাণিজ্য করিবার অনুমতি দিতে বাধ্য হইল। এই সব সুবিধা লাভ করিয়াও ইংরেজদের তৃপ্তি হইল না, তাহাদের লোভ আরও বাড়িয়া গেল। তাহারা আরও সুবিধা আদায় করিয়া লইল।

ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলিও চীনের সহিত বাণিজ্য করিতে আগাইয়া আসিল এবং নূতন নূতন বন্দরে বাণিজ্য করিবার অধিকার লাভ করিল। ক্রমে ক্রমে তাহারা চীনের বৈদেশিক বাণিজ্য পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করিতে আরম্ভ করিল। যে সব ইউরোপীয় চীনে বাস করিত, তাহারা কোন অপরাধ করিলেও চীনা সরকার তাহাদের বিচার করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল।

জাপান পর্যন্ত চীনের দুর্বলতার সুযোগ লইতে দ্বিধা করিল না, তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। যুদ্ধে চীনের পরাজয় হইল। তাহার এই পরাজয়ের ফলে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সাহস আরও বাড়িয়া গেল। তাহারা চীনের উপর তাহাদের বন্ধন দৃঢ়তর করিয়া উহার একতা এবং স্বাধীনতাকে লুপ্তপ্রায় করিয়া তুলিল।

তবুও তাহারা চীনের জাতীয় জীবন ধ্বংস করিতে পারিল না। ঐ দেশের বহু অধিবাসী তাহাদের সংকট বুঝিতে পারিল এবং উহার প্রতিকার করিতে যত্নশীল হইল। ইহাদের অনেকে মনে করিল, ইউরোপীয় আদর্শে চীনের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে উন্নত করিয়া উহাকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে পারিলে পাশ্চাত্য শাসন ও শোষ-ণের অবসান করা সম্ভব হইবে। কিন্তু প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের

পথে বাধার অন্ত ছিল না। ঐ সব বাধা অতিক্রম করিবার ধৈর্য চীনাদের ছিল না। সুতরাং চীনকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার জন্য তাহারা অপেক্ষা করিল না, সরাসরি ভাবে তাহারা বৈদেশিক প্রভুত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করিল। এই আন্দোলনের ফলে অনেক ইউরোপীয়কে প্রাণ হারাইতে হইল এবং অনেক ইউরোপীয় সম্পত্তি ধ্বংস হইল।

ইউরোপের রাষ্ট্রনায়কেরা এই অসংযম ক্ষমা করিলেন না। চীনে রক্তের নদী প্রবাহিত করিয়া তাঁহারা ইহার প্রতিশোধ লইলেন। যাহারা বিদেশীদের হাতে প্রাণ হারাইয়াছিল, তাহাদের আত্মদান কিন্তু ব্যর্থ হইল না। ইহার ফলে স্বাধীনতা লাভের সংকল্প চীনাদের মনে আরও দুর্জয় হইয়া উঠিল।

ঐ সময় চীনে মাঞ্চু রাজবংশের সম্রাটগণ রাজত্ব করিতেন ; জন-সাধারণের আশা ও আকাঙ্ক্ষার সহিত ইঁহাদের অনেকেরই সহানুভূতি ছিল না। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পাশ্চাত্য শোষণ ও মাঞ্চুশাসনের বিরুদ্ধে চীনের জনমত ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠে ঐ সময় কয়েকজন প্রতিভাশালী নেতার আবির্ভাব হয়। ইঁহাদের মধ্যে প্রধান হইলেন সান ইয়াৎ সেন। সান-ইয়াৎ-সেন-এর পরিচালনায়, চীনের জাতীয় আন্দোলন বিপ্লবের রূপ ধারণ করে। ঐ বিপ্লবের ফলে মাঞ্চু রাজবংশের অবসান হয় এবং চীনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন

সান-ইয়াৎ-সেন 'গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করিলেন, কিন্তু চীনের সকল অধিবাসীকে সম্মিলিত ও স্বাধীন করিয়া তোলা তাঁহার পক্ষেও সম্ভব

হইল না। তখনও চীনারা একতার মূল্য বুঝিতে পারে নাই। তখনও অনেকে দলের স্বার্থ দেশের স্বার্থ অপেক্ষা বড় বলিয়া মনে করিত। তখনও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বিরোধ চলিত। তখনও বহু জমিদার সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে চাহিত না, এমন কি, শত্রুপক্ষের সহিত যোগ দিতেও দ্বিধা করিত না। এই অবস্থায় ইউরোপীয়দের শোষণ দূর করা সম্ভব হইল না। জাপানীরাও নূতন নূতন দাবী উপস্থিত করিবার সুযোগ লাভ করিল।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে চীন, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্রের পক্ষ গ্রহণ করে। যুদ্ধে ঐ সব রাষ্ট্রের জয় হয়। যাহারা তাহাদের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের অনেককেই যথেষ্ট পুরস্কার দেওয়া হইল। কিন্তু চীনা রাষ্ট্রদূতকে সন্ধি সভা হইতে শূন্য হাতে ফিরিয়া আসিতে হইল। ইউরোপীয় শোষণ দূর হইল না। জাপানকে সংযত করা হইল না।

চিয়াং-কাই-শেক

সান-ইয়াৎ-সেন তবুও নিরুদ্যম হইলেন না। তিনি পূর্বেই কুয়ো-মিন-টাং (Kuo-Min-Tung) নামক একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়া ছিলেন। ঐ প্রতিষ্ঠানকে তিনি পুনর্গঠিত করিলেন। উহার আদর্শ হইল চীনের একতা বিধান করা, উহার জাতীয় জীবনকে স্বাধীন করিয়া তোলা এবং উহার সর্বাঞ্চল জুড়িয়া জন-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করা। তাঁহার মৃত্যুর পরে চিয়াং কাই শেক বহু যুদ্ধ

করিয়া সমস্ত চীনকে একই শাসনের ছায়ায় আনিতে সমর্থ হন। তবুও চীনে একতা প্রতিষ্ঠিত হইল না। কুয়ো-মিং-টাংয়ের জাতীয়তাবাদী ও সাম্যবাদী সভ্যেরা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। প্রায় দশ বৎসর ধরিয়া চীনারা বিভেদ ও কলহে লিপ্ত থাকিয়া তাহাদের শক্তি ক্ষয় করিতে লাগিল, আর তাহাদের এই শক্তিক্ষয়ের সুযোগে জাপান নূতন করিয়া তাহাদের দেশ আক্রমণ করিবার আয়োজন করিল। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে তাহারা ঐ আক্রমণের ফলে চীনকে মাঞ্চুরিয়া হারাইতে হইল। মাঞ্চুরিয়া লাভ করিয়াও জাপান ক্ষান্ত হইল না। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে চীনের বিরুদ্ধে আবার অভিযান আরম্ভ করিল। ইহার দুই বৎসর পরে ইউরোপে আবার মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। জাপান জার্মানীর সহিত এবং চীন জার্মানীর শত্রুদের সহিত যোগ দিল। এইরূপে চীন-জাপানের যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধের সহিত মিশিয়া গেল।

জাপানের বার-বার আক্রমণের ফলে চীনের অশেষ ক্ষতি সাধিত হয়। কিন্তু ক্ষতির সঙ্গে উপকারও হয়। জাপানের অন্যায় আক্রমণের ফলে চীনাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ নূতন করিয়া সঞ্চারিত হয়। তাহারা একতার মূল্য বুঝিতে পারে। তাহাদের এই অনুভূতি ক্রমেই ব্যাপক ও গভীর হইয়া তাহাদের মুক্তির পথ সুগম করিয়া তোলে।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত চীনের ন্যায় জাপানও ছিল বিদেশীদের সংস্রবের বাহিরে। কেবলমাত্র চীনা এবং ওলন্দাজদের ঐ দেশে অবস্থান করিবার অনুমতি ছিল। সুতরাং ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত জাপানের রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবন প্রাচীন পথ ধরিয়া চলিত।

জাপানে যিনি রাজত্ব করিতেন তাঁহাকে বলা হইত মিকাডো। মিকাডো তাঁহার প্রজাদের নিকট দেবতার সম্মান লাভ করিতেন।

দেবতার মতই তিনি থাকিতেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। তিনি শাসন-কার্য পরিচালনা করিতেন না। ঐ কাজ করিতেন তাঁহার 'শোগুন' (সেনা-পতি)। শোগুন ছিলেন সুপ্রচুর ক্ষমতার অধি-কারী, কিন্তু তাঁহার ক্ষমতাও অবিসংবাদী ছিল না। জাপানে তখনও জাতীয় একতা স্থাপিত হয় নাই। এই একতাকে বাধা দিয়া আসিতেছিল অনেকগুলি কুল বা clan। শোগুন ছিলেন একটি কুলের কর্তা। অন্যান্য কুল-পতিরাও ক্ষমতা দাবী করিতেন। দেশে অনেক বড় বড় জমিদার ছিলেন। ইঁহাদের অনেক অনুচর ছিল। অনুচরগণকে বলা হইত 'সামুরাই'। ইহারাই ছিল জাপানের সৈন্য।

মেইজি যুগের মিকাডো মুৎসুহিতো

সামুরাই

জাপানের সামাজিক জীবনেও একতা ছিল না, ছিল বিস্তৃত শ্রেণী বিভাগ। সকল শ্রেণীর লোকের শিক্ষার আলোক লাভ করিবার সুযোগ ছিল না। আর্থিক উন্নতি লাভ করিবার পথও ছিল সংকীর্ণ। বিদেশের সহিত সংযোগ না

থাকায় বাণিজ্যের বিশেষ অবকাশ ছিল না, ফলে মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষ হইত। দুর্ভিক্ষের ফলে বহু লোককে প্রাণ হারাইতে হইত।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই সব অবস্থার আমূল পরিবর্তন হইল। এই পরিবর্তন বিদেশীদের জাপানে অনুপ্রবেশেরই ফল। ঐ অনুপ্রবেশ আরম্ভ হয় ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের পর হইতে। ঐ বৎসর কমোডোর পেরী নামক আমেরিকার একজন সেনাপতি জাপানে গিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার সঙ্গে ছিল চারখানা রণতরী। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইয়া জাপানী সরকারের নিকট জাপানী বন্দর ব্যবহার করিবার অনুরোধ জানাইলেন। পর বৎসর তিনি আটখানা রণতরী ও চার হাজার সৈন্য সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহার দাবীর পুনরাবৃত্তি করিলেন। জাপান অনেক দ্বিধার পর পেরীর অনুরোধ রক্ষা করিতে রাজী হইল। যুক্তরাষ্ট্র দুইটি জাপানী বন্দর ব্যবহার করিবার অনুমতি লাভ করিল।

যুক্তরাষ্ট্রকে সুবিধা দিয়াই জাপান অব্যাহতি পাইল না। ঐ নজির অবলম্বন করিয়া ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি অনুরূপ সুযোগ দাবী করিল এবং বন্দরের পর বন্দর ব্যবহার করিবার অনুমতি আদায় করিল। ক্রমে তাহাদের দাবী আরও বাড়িতে লাগিল। জাপান ঐ সব দাবী পূর্ণ করিয়া তাহাদিগকে নূতন নূতন অধিকার দিতে বাধ্য হইল। যাহারা জাপানে অবস্থান করিত, স্থির হইল তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইলে ঐ সব অভিযোগের বিচার করিবে তাহাদের দেশীয় বিচারকেরা। তাহাদের বিচার হইবে তাহাদের দেশের আইন অনুসারে। তাহারা স্বাধীনভাবে তাহাদের ধর্ম পালন করিতে পারিবে। তাহারা অবাধে জাপানের অভ্যন্তরে ভ্রমণ করিতে পারিবে।

বিদেশীদের অনুপ্রবেশের প্রতিক্রিয়া ঃ বিদেশীরা কিন্তু ঐ সব সুযোগ বেশীদিন ভোগ করিতে পারে নাই। চীনের ন্যায় জাপান তাহার বিপদে বেশীদিন উদাসীন থাকে নাই। স্বাধীনতা হারাইবার সম্ভাবনায় তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। জাপানের রাষ্ট্রনায়কেরা বুঝিতে পারে স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে তাহাদিগকে ইউরোপীয়দের মত শক্তিশালী হইতে হইবে। আর ঐরূপ হইতে হইলে ইউরোপীয় আদর্শে জাপানের জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিতে হইবে। প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করিবার পথে যে সকল বাধা ছিল, একটি বিপ্লবের সাহায্যে তাহারা সেগুলি দূর করে। তাহারা রাজনৈতিক একতার প্রতিষ্ঠা করে, সামন্ততন্ত্রের অবসান করে, পুরাতন সৈন্যবাহিনী ভাঙ্গিয়া দিয়া ইউরোপীয় আদর্শে সৈন্যবাহিনী গড়িয়া তোলে; শ্রেণীবিভাগ কমাইয়া দিয়া সমাজে একতার পথ সুগম করে এবং সকলের জন্য শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে। তাহারা নৌবাহিনীর সংস্কার সাধন করে, বিভিন্ন শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করে, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি নির্মাণ করে, পোতাশ্রয় গঠন করে, কয়লার খনির ব্যবহার আরম্ভ করে এবং রেশমের কল স্থাপন করে।

এই সব সংস্কারের ফলে অতি অল্পকালের মধ্যেই জাপান একটি আধুনিক রাষ্ট্র হইয়া উঠে। তাহার শিল্পেরও অসামান্য উৎকর্ষ হয়। সুলভ ও সুন্দর অসংখ্য জাপানী শিল্পদ্রব্যে সুদূর বিদেশের পণ্যশালাগুলি ভরিয়া উঠে। জাপানের সামরিক শক্তিও ক্রমেই প্রবল হইতে থাকে।

দুঃখের বিষয় জাপান ইউরোপীয় শিল্প ও যুদ্ধ-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের আদর্শও তাহাকে পাইয়া বসে।

সাম্রাজ্যবাদী জাপান ঃ জাপানী সাম্রাজ্যবাদের আঘাত প্রথমে গিয়া পড়ে চীনের উপর। কারণ, ঐ আঘাত প্রতিরোধ করিবার মত শক্তি চীনের ছিল না। জাপানী রাষ্ট্রনায়কেরা চীনের নিকট দাবী করিলেন,—কোরিয়া নামক প্রদেশটিকে স্বাধীন করিয়া দিতে হইবে। কোরিয়ার প্রতি তাহাদের কোন প্রীতি ছিল না। কোরিয়া স্বাধীন হইলে উহাকে জাপানী প্রভাবের অধীন করা সহজ হইবে, ইহাই ছিল তাঁহাদের মূল উদ্দেশ্য। চীন তাহাদের দাবী মানিতে রাজী হইল না, তখন তাঁহারা চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। যুদ্ধে তাঁহাদেরই জয় হইল। কোরিয়াকে স্বাধীন করিয়া, জাপানকে কয়েকটি স্থান, প্রচুর ক্ষতিপূরণ ও বাণিজ্য করিবার সুযোগ দিয়া চীন সন্ধি করিতে বাধ্য হইল।

জাপানের জয়ের আরও দুইটি ফল হইল। প্রথমতঃ তাহার শক্তির পরিচয় পাইয়া বিদেশীরা পূর্বের ন্যায় বিশেষ অধিকার দাবী করিতে সাহস করিল না। জাপানে অবস্থান কালে জাপানের আইন-কানুন মানিয়া চলিতে রাজী হইল। দ্বিতীয়ত, বিশাল চীনকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারায় জাপানের উচ্চাশা আরও বাড়িয়া গেল।

চীনের মাঞ্চুরিয়া নামক আর একটি প্রদেশে তাহার লোলুপ দৃষ্টি পড়িল। রাশিয়াও ঐ প্রদেশটি গ্রাস করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। মাঞ্চুরিয়ায় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে জাপানের বিশেষ ক্ষতি হইত, জাপানের পক্ষে তাহার সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করা কঠিন হইত। তাহার আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা পর্যন্ত বিপন্ন হইত। সুতরাং জাপান রাশিয়ার ঐ উদ্যোগের বিরোধিতা করিতে দ্বিধা করিল না। ফলে উভয়ের মধ্যে কলহ আরম্ভ হইল। কলহ প্রকাশ্য যুদ্ধে পরিণত হইল। অনেকেই মনে করিয়াছিল এইবার জাপান শেষ হইয়া যাইবে। যুদ্ধের ফল কিন্তু হইল

বিপরীত। চীনের ন্যায় রাশিয়াকেও ক্ষুদ্রকায় জাপানের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইল।

অমিত সম্পদ ও শক্তির অধিকারী রাশিয়াকে পরাজিত করিতে পারায় জাপানের মর্যাদা বহুগুণে বাড়িয়া যায়। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে তাহার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। দুঃখের বিষয় ঐ জয়ের ফলে তাহার সাম্রাজ্যলিপ্সা আরও তীব্র হইয়া উঠে। ইহারই নির্দেশে জাপান জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেয়। চীনের যে সকল অঞ্চল জার্মানী তাঁহার প্রভাবাধীন করিয়াছিল, জাপান যুদ্ধের সুযোগে সেগুলি কাড়িয়া লয়। নিরপরাধ চীনের কয়েকটি প্রদেশে প্রভুত্ব বিস্তৃত করিতেও তাহার সংকোচ হয় না। জাপান কিন্তু অবাধে চীনে তাহার সাম্রাজ্যবাদ চালাইয়া যাইতে পারিল না। তাহার প্রভাবের বৃদ্ধি দেখিয়া আমেরিকা ও ইউরোপে উদ্বেগের সঞ্চার হইল। এই উদ্বেগ প্রতিফলিত হইল ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ওয়াশিংটনে আহূত একটি মন্ত্রণাসভায়। ঐ সভায় পৃথিবীর কয়েকটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা প্রতিশ্রুতি দিলেন, তাঁহারা চীনের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা মানিয়া চলিবেন। চাপে পড়িয়া জাপানেও প্রতিশ্রুতিপত্রে স্বাক্ষর করিতে হইল।

কয়েক বৎসর জাপান তাহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিল। কিন্তু ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে চীনের বিরুদ্ধে তাহার অভিযান নূতন করিয়া শুরু হয়। ফলে উভয় দেশের মধ্যে একটি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের সূচনা হইল। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে চীন-জাপানের যুদ্ধ উহার সহিত মিশিয়া গেল।

কালপঞ্জী

খৃঃ ১৮৩৯—৪২ অহিফেন যুদ্ধ

খৃঃ ১৮৫৪ জাপানের রুদ্ধদ্বার মোচন

খৃঃ ১৮৬৭— ৬৮ জাপনের বিপ্লব
খৃঃ ১৮৯৪—৯৫ প্রথম চীন-জাপানের যুদ্ধ
খৃঃ ১৯৬০ চীনে বিদেশী বিরোধী আন্দোলন
খৃঃ ১৯০৪— ৫ রুশ-জাপানের যুদ্ধ
খৃঃ ১৯১১ চীনে বিপ্লব
খৃঃ ১৯২১ ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্স
খৃঃ ১৯১১ দ্বিতীয় চীন-জাপানের যুদ্ধ
খৃঃ ১৯৩১ চীনের বিরুদ্ধে জাপানের অভিযান
খৃঃ ১৯৩৭ তৃতীয় চীন জাপানের যুদ্ধ
খৃঃ ১৯৩৭ চীনের বিরুদ্ধে জাপানের অভিযান

অনুশীলনী

১। ইউরোপীয়দের অনুপ্রবেশের প্রতিক্রিয়া চীন ও জাপানে একই রূপ হয় নাই, এরূপ মনে করিবার কি কারণ আছে?

২। কিভাবে চীনে ইউরোপীয় প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়?

৩। চীনে কি কারণে বিদেশী-বিরোধী আন্দোলন হয়? ঐ আন্দোলনের ফল কি হয়?

৪। সান-ইয়াৎ-সেন চীনের কি উপকার করেন?

৫। জাপানে কিভাবে ইউরোপীয় প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়?

৬। জাপান কিভাবে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে আপনার জাতীয় জীবন গড়িয়া তোলে?

৭। জাপান কি কারণে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে? ঐ যুদ্ধের কি ফল হয়?

৮। রুশ-জাপান যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর।

৯। জাপানের সাম্রাজ্যবাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

———

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রুশ-বিপ্লব ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র

জাপানের হাতে রাশিয়ার পরাজয়ের কথা বলিয়াছি। ঐ পরাজয়ের মাত্র দশ বৎসর পরে রুশ সরকারকে একটি আরও ভীষণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতে হয়। বিপর্যয় আসে বিপ্লবের রূপ ধরিয়া। ইতিহাসে ইহা রুশ-বিপ্লব নামে পরিচিত। ফরাসী-বিপ্লবের ন্যায় রুশ-বিপ্লবের ফলেও সভ্যতার গতি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়।

যে ভাবধারা হইতে রুশ বিপ্লব উৎসারিত হয় তাহার প্রচলন হইয়াছিল ইউরোপে, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। যাঁহারা উহার প্রবর্তন করেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হইতেছেন কার্ল মার্কস্।

কার্ল মার্কস্

মার্কস্-এর জন্ম হইয়াছিল জার্মানীতে, কিন্তু তিনি ইংলণ্ডে বহু বৎসর অতিবাহিত করেন। ঐ সময় ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব পূর্ণবেগে চলিতেছিল। তিনি লক্ষ্য করেন মুষ্টিমেয় একদল ধনী অর্থ দিয়া কারখানা চালাইতেছে, আর উহার মুনাফা নিজেরা আত্মসাৎ করিয়া সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু যাহাদের শ্রমে কারখানা চলিতেছে, উন্নতির সকল সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহারা পশুর পর্যায়ে নামিয়া

আসিয়াছে। কারখানার মালিকদের নিকট ইহারা অর্থ উপায়ের যন্ত্র মাত্র। ইহাদের আর কোনও সার্থকতা নাই, সমাজে ইহাদের আর কোনও প্রয়োজন নাই।

মার্কস্ কিন্তু ইহাদিগকে যন্ত্র বলিয়া মনে করেন নাই। ইহাদের মধ্যে যে অসীম সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা তিনি অনুভব করেন। তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেন—একদিন ধনতন্ত্রমূলক সমাজের অবসান হইবে, ধনীদের প্রভাব লুপ্ত হইবে, তাহাদের সঞ্চিত ধনরাশি সমাজের সম্পত্তি হইবে; আর সেই সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবে শ্রমিকদের প্রাধান্য; শ্রমিকদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইবে কেবলমাত্র সামাজিক জীবন নয়, রাজনৈতিক জীবন পর্যন্ত। মার্কস্-এর এই ভবিষ্যৎবাণী রূপলাভ করিয়াছিল উল্লিখিত রুশ বিপ্লবে।

ঐ বিপ্লবের ফলে রাশিয়ার স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র ভাঙ্গিয়া যায় এবং ঐ দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে শ্রমিক ও কৃষকদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বিপ্লবের পরিণতির কথা বলিবার পূর্বে কি কারণে এবং কিভাবে উহার আবির্ভাব হইল, আমরা সংক্ষেপে সেই কথা বলিতেছি।

রুশ-বিপ্লবের কারণ ঃ কোন বিপ্লবই অকারণে আসে না। রুশ বিপ্লবও আসে নাই। রুশ সাম্রাজ্যের অপরিমিত ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরের অন্তরালে অনেকদিন ধরিয়া অলক্ষিতভাবে ইহার আয়োজন চলিতেছিল। খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও ইউরোপীয় সংস্কৃতির আলোক রাশিয়ার অভ্যন্তরে অবাধে প্রবেশ করিতে পারে নাই। তখনও জনকল্যাণের আদর্শ উহার শাসকগণকে উদ্বুদ্ধ করে নাই। তখনও জমিদারের সমাজে প্রাধান্য ছিল। ইহাদের শীর্ষে ছিলেন সম্রাট বা জার। তিনি শাসন করিতেন আপনার খুশী অনুসারে। তিনি জনমতের ধার ধারিতেন না। তাঁহার অবলম্বন ছিল,

জনসাধারণের শুভ ইচ্ছা নয়, তাঁহার সৈনিকদের আগ্নেয়াস্ত্র, আর তাঁহার গুপ্তচরদের গোপন সংবাদ।

জমিদারের জীবন ছিল অলস বিলাসে পরিপূর্ণ। তাঁহারা বাস করিতেন অপরিমেয় ঐশ্বর্যের মধ্যে। কিন্তু যাহারা সারাদিন পরিশ্রম করিয়া জমিদারদের জীবন শোভা ও সম্পদে ভরিয়া দিত, সেই সব হতভাগ্য চাষীদের ভাগ্যে—বন্ধন, পীড়ন, দুঃখ, অপমান, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, আর অভাব ছিল। অথচ দেশে ইহাদেরই সংখ্যা ছিল সর্বাধিক।

তখনও রাশিয়ায় শিল্পের বিশেষ বিকাশ হয় নাই। যে কয়টি শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল, তাহাদের অনেকগুলিই চলিত বিদেশীদের মূলধনে।

জমিদার. কৃষক ও শ্রমিক লইয়াই কিন্তু রাশিয়ার সমাজ গঠিত ছিল না: ঐ সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীরও লোক ছিল। ইহাদের সংখ্যা ও শক্তি বেশী ছিল না। কিন্তু ইহাদের মধ্যে শিক্ষার আলোক প্রবেশ করিয়াছিল, রাজনৈতিক চেতনারও সঞ্চার হইয়াছিল। ইহাদের অনেকে জারের দায়িত্বহীন নিপীড়ন পছন্দ করিত না। দল গড়িয়া উহার বিরোধিতা করিতেও তাহারা দ্বিধা করিত না। এই সব বিরোধীদের অনেকে ছিলেন মার্কসের শিষ্য। লেনিন ছিলেন ইঁহাদের নেতা। লেনিন ছিলেন স্বাধীনতার নির্ভীক সৈনিক। তাঁহার নির্ভীকতার জন্য তাঁহাকে রাজরোষে পড়িতে হয় এবং বহু বৎসর সাইবেরিয়ায় নির্বাসিতের জীবন যাপন করিতে হয়। কিন্তু কোন অবস্থায়ই

লেনিন

স্বাধীনতার দীপ তাঁহার করভ্রষ্ট হয় নাই। আর ঐ দীপকে ধ্রুবতারার মত অনুসরণ করিয়া তাঁহার অনুবর্তীরা নির্যাতনের নিবিড় অন্ধকারের মধ্য দিয়া নির্ভয়ে আপনাদের পথ করিয়া লইয়াছে।

জার যখন দেখিলেন শত নির্যাতনেও রাজনৈতিক মুক্তির আন্দোলন নির্বাপিত হইল না, তখন তিনি কতকগুলি অধিকার ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহার এই দান কৃপণের দানমাত্র। ইহাতে তাঁহার স্বেচ্ছাচারী শাসনের বিশেষ কোন পরিবর্তন হইল না।

তাঁহার এই কৃপণতা তাঁহার পক্ষে কল্যাণকর হইল না। জনসাধারণের প্রীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত না হইলে কোন শাসনই স্থায়ী শক্তিলাভ করিতে পারে না। জারের শাসনও পারিল না; কর্মদক্ষতা হারাইয়া ক্রমে দুর্বল হইয়া পড়িল। শেষে ইহার ধ্বংস অপরিহার্য হইয়া উঠিল। তবুও জারের চেতনা হইল না। স্বেচ্ছাচারী জার, বরং তাঁহার সাম্রাজ্যকে আরও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার লাভ হইল না। তাঁহার সৈন্যেরা একাধিক যুদ্ধে পরাজিত হইল।

জারের আচরণের ফলে রাশিয়ার জনসাধারণ তাঁহার প্রতি আরও বিরক্ত হইয়া উঠিল। রাজপুরুষদের কুশাসনের ফলে তাহাদিগকে বহু দুঃখ সহ্য করিতে হইতেছিল। রাশিয়া যুদ্ধে যোগ দেওয়ায় তাহাদের দুঃখ বহুগুণ বাড়িয়া উঠিল। শ্রমিক কৃষকগণকে সৈনিকের বৃত্তি গ্রহণ করিতে হইল। সুপরিচালনার অভাবে তাহাদিগকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। জার্মানরা ক্রমেই আগাইয়া আসিতে লাগিল, ফলে চারিদিক বিশৃঙ্খলায় ভরিয়া উঠিল। খাদ্যদ্রব্য ক্রমেই মহার্ঘ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। শেষে অবস্থা সহ্যের

অতীত হইল। ইহার প্রতিকারের উপায় দেখিতে না পাইয়া অগণিত লোক বিপ্লবের আশ্রয় লইল।

বিপ্লবের আবির্ভাবঃ বিপ্লব আসিল দাঙ্গার মধ্য দিয়া। বড় বড় শহরের বহু অধিবাসী খাদ্য না পাইয়া দাঙ্গা আরম্ভ করিল। সরকার দাঙ্গা দমন করিবার জন্য সৈন্য পাঠাইলেন। সৈন্যেরা কিন্তু দাঙ্গাকারীগণকে ছত্রভঙ্গ করিল না, বরং তাহাদের সহিত যোগ দিয়া তাহাদিগকে বহুগুণে শক্তিশালী করিয়া তুলিল। তাহাদের প্রভাব ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। দেখিতে দেখিতে সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করিল। বিদ্রোহীরা জারকে সিংহাসন হইতে তাড়াইয়া দিল এবং রাশিয়ায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিল।

যাঁহারা প্রথমে রুশ গণতন্ত্র পরিচালনার অধিকার লাভ করিলেন, তাঁহাদের শাসনকাল বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। তাঁহারা জনসাধারণের কতকগুলি দাবী পূর্ণ করিতে পারেন নাই। এই সব দাবীর মধ্যে প্রধান হইতেছে, যুদ্ধ হইতে রাশিয়াকে সরাইয়া আনিতে হইবে, সকলকে খাদ্য সরবরাহ করিতে হইবে এবং কৃষকদের স্বার্থে জমি ভাগ করিয়া দিতে হইবে। শ্রমিক ও সৈনিকেরা পেট্রোগ্রাড ও রাশিয়ার আরও কয়েকটি বড় বড় শহরে কতকগুলি সমিতি গড়িয়া তুলিয়াছিল। এইরূপ সমিতিকে বলা হইত সোভিয়েট। সোভিয়েটগুলিতে যাহাদের প্রাধান্য ছিল তাহাদিগকে বলা হইত **বলশেভিক**। পরে ইহারা **কমিউনিস্ট** বা **সাম্যবাদী** বলিয়া পরিচিত হয়।

বলশেভিকরা জনসাধারণের উল্লিখিত দাবীসমূহ সমর্থন করিয়া বিশেষ লোকপ্রিয় হইয়া উঠে। রুশ সরকারের ঐ সব দাবী পূরণে ব্যর্থতার ফলে তাহাদের লোকপ্রিয়তা আরও বাড়িয়া উঠে। ঐ সময় জার্মানদের হাতে রাশিয়ার পরাজয় হয়। এই পরাজয়ের ফলে রুশ

সরকারের বিরুদ্ধে লোকের অসন্তোষ তীব্রতর হইয়া উঠে এবং দেখিতে দেখিতে প্রকাশ্য বিদ্রোহের রূপ ধারণ করে। বিদ্রোহের আঘাতে রুশ সরকারের ক্ষমতা ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং রাশিয়ায় বলশেভিকদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর এই বিপ্লব সংঘটিত হয়। এই কারণে প্রতি বৎসর ঐ দিনটি রুশ বিপ্লব দিবস বলিয়া কমিউনিস্টরা পালন করিয়া থাকে।

বলশেভিকদের কৃতিত্ব ঃ সোভিয়েট রাশিয়ার শাসন পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন স্বয়ং **লেলিন**। তাঁহার সহকর্মীদের মধ্যে প্রধান হইলেন **ট্রট্স্কি ও স্ট্যালিন**। লেলিন প্রথমে যুদ্ধ হইতে রাশিয়াকে সরাইয়া আনিলেন। তারপর তাঁহার কাজ হইল রাশিয়াকে নূতন আদর্শে গড়িয়া তোলা। রাশিয়ার প্রদেশগুলি সোভিয়েট গণতন্ত্রে রূপান্তরিত হইল। উহাদের আদর্শ হইল সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন। এই সব গণতন্ত্রের সম্মেলনে একটি যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি হইল। ঐ যুক্তরাষ্ট্রের নাম হইল সোভিয়েট রাষ্ট্র (Union of Soviet Socialist Republics)। ইহার সংক্ষিপ্ত নাম হইল ইউ. এস. এস আর (U.S.S.R.)।

ট্রট্স্কি

সোভিয়েট সরকারকে প্রথমে ভীষণ অসুবিধার মধ্যে পড়িতে হয়। সোভিয়েট রাশিয়ার আদর্শ হইল, সকল প্রকার শোষণ ও বৈষম্য হইতে মানুষকে মুক্ত করিয়া তাহাদিগকে এক শ্রেণীহীন

সোভিয়েট সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্র (ইউ. এস্. এস্. আর.)

সমাজের অন্তর্ভুক্ত করা। শোষণ ও বৈষম্য সাম্রাজ্যবাদের অপরিহার্য অঙ্গ। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে আরম্ভ করিল। উহার বিভিন্ন অঞ্চল আক্রমণ করিতেও তাহারা দ্বিধা করিল না। সোভিয়েট বিপ্লবের ফলে যাহাদের স্বার্থহানি হইয়াছিল, তাহাদের অনেকে রাশিয়ার মধ্যে থাকিয়া সোভিয়েট সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিল। দেশে এক অতি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষও দেখা দিল। কিন্তু লেলিন ও তাঁহার সহকর্মীদের অক্লান্ত কর্মশক্তি, অদম্য উৎসাহ ও অচঞ্চল আত্মবিশ্বাসের ফলে সোভিয়েট রাশিয়া বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ সকল বিপদ অতিক্রম করিয়া ক্রমেই শক্তিশালী হইয়া উঠিল। যাহারা রাশিয়ার দুর্দিনে তাহার সর্বনাশে তৎপর হইয়াছিল, তাহারা আসিয়া তাহাকে স্বীকার করিয়া লইল। এমন কি কেহ কেহ তাহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিতেও ব্যগ্র হইল।

বলশেভিকেরা সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র গড়িয়া তুলিয়া এবং উহাকে শক্তিশালী করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহারা আরও বড় কাজ করিয়াছে। তাহারা শ্রেণীহীন সমাজের আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে তাহারা পুঁজিপতিদের নিকট হইতে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির এবং জমিদারদের নিকট হইতে জমির মালিকানা স্বত্ব কাড়িয়া লইয়াছে। শিল্পপ্রতিষ্ঠানগু লকে সর্বসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত করা হইয়াছে এবং সেগুলি তাহাদেরই স্বার্থে সোভিয়েট সরকার কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে। তাহাদের প্ররোচনায় কৃষকেরা ছোট ছোট ক্ষেত ছাড়িয়া দিয়াছে। ঐগুলিকে মিলিত করিয়া বড় বড় ক্ষেত তৈয়ারী করিয়াছে। ঐ সব ক্ষেতে আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে গ্রামের সকল কৃষকেরা একত্রে চাষ করিয়া থাকে। এই প্রথাকে বলা হয় যৌথ বা মিলিত কৃষিপ্রথা।

সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নততর করিবার উদ্দেশে বিনামূল্যে চিকিৎসা এবং প্রায় বিনামূল্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এই সব পরিবর্তন সম্পন্ন করিতে বহু বৎসরের প্রয়োজন হইয়াছিল। ইহাদের সকলগুলি একসঙ্গে আরম্ভ করা হয় নাই। প্রথমে কতকগুলি পরিবর্তনের পরিকল্পনা করা হয়। ঐ পরিকল্পনা পাঁচ বৎসর কালের মধ্যে কার্যে পরিণত করা হয়। তারপর আবার কতকগুলি পরিবর্তনের পরিকল্পনা করা হয় এবং পাঁচ বৎসরের মধ্যে ঐ পরিকল্পনার বাস্তবরূপ দেওয়া হয়। এইজন্য এই সমস্ত পরিকল্পনাকে বলা হয় **'পাঁচশালা'** পরিকল্পনা। এইরূপ কয়েকটি 'পাঁচশালা' পরিকল্পনার ফলে রাশিয়ার বহুমুখী উন্নতি সাধিত হইয়াছে। **স্ট্যালিন** লেলিনের মৃত্যুর পরে সোভিয়েট রাশিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং বহু বৎসর ধরিয়া উহার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করেন। স্ট্যালিনের 'পাঁচশালা' পরিকল্পনার ফলে রাশিয়ার সম্পদ বহুগুণে বর্ধিত হইয়াছে। আধুনিক পদ্ধতি শিল্প ও কৃষিকর্মে প্রযুক্ত করা হইয়াছে এবং সকল লোকের জন্য কর্মের সংস্থান করা হইয়াছে। এইসব উন্নতির ফলে জারশাসিত অবনত রাশিয়া পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আপনার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছে।

স্ট্যালিন

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত উজ্‌বেকিস্তানের অধিবাসী

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত পামীর অঞ্চলের অধিবাসী

রাশিয়ায় শাসন বিষয়েও যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। এই বিরাট যুক্তরাষ্ট্রের শাসনভার ন্যস্ত হইয়াছে 'নিখিল রুশ সোভিয়েট মহাসভা'র (All Russian Congress of Soviets) হাতে। ঐ মহাসভার মূলে কিন্তু রহিয়াছে সাধারণ লোকদের স্থানীয় সমিতি বা সোভিয়েটনিচয়। সোভিয়েট রাশিয়ায় বলশেভিক বা কমিউনিস্টরা সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ন্ত্রিত করে। জারদের সময় বহু জাতিকে রাশিয়ার অধীনে আনা হইয়াছে। ইহাদিগকে
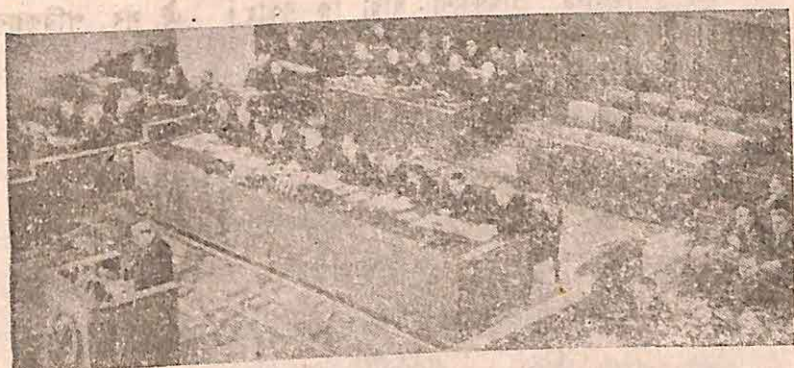
সর্বোচ্চ সোভিয়েটের অধিবেশন

অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করিতে হইত। বলশেভিক বা কমিউনিষ্ট-দের শাসনকালে ঐসব জাতিকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইয়াছে। অঞ্চলগুলিকেও গণতন্ত্রে পরিণত করা হইয়াছে।

কালপঞ্জী

খৃঃ ১৮১৮—১৮৮৩	কার্ল মার্কস্
খৃঃ ১৯১৭ (মার্চ)	রুশ বিপ্লবের আরম্ভ
খৃঃ ১৯১৭ (৭ই নভেম্বর)	বলশেভিকদের ক্ষমতালাভ
খৃঃ ১৯২৩	রাশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

অনুশীলনী

১। রুশ সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরের অন্তরালে অনেকদিন ধরিয়া বিপ্লবের আয়োজন চলিতেছিল, এরূপ মনে করিবার কি কারণ আছে ?

২। রুশ-বিপ্লবের পূর্বে রাশিয়ার অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা কর ?

৩। কি অবস্থায় রুশ-বিপ্লব সাধিত হয় ?

৪। লেলিনের সহিত রুশ-বিপ্লবের কি সম্পর্ক ?

৫। বলশেভিকদের কৃতিত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৬। 'পাঁচশালা' পরিকল্পনা দ্বারা কি বুঝায় ? ঐ সব পরিকল্পনায় রাশিয়ার কি উপকার হইয়াছে ?

চতুর্দশ অধ্যায়

প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধ
জাতিসংঘ ও সম্মিলিত জাতি সংগঠন

আমরা প্রসঙ্গক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উল্লেখ করিয়াছি। দুইটি যুদ্ধই হইয়াছিল বর্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগে। দুইটি যুদ্ধের ফলেই অগণিত লোককে অবর্ণনীয় দুঃখ ও ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছে। দুইটি যুদ্ধই মানব ইতিহাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছে।

দুইটি যুদ্ধই আরম্ভ করিয়াছিল জার্মানী। তবু উহাদের জন্য একা জার্মানীকে অপরাধী করা চলে না। বিদেশে উপনিবেশ বিস্তার ও ব্যবসায়ের প্রসার করিয়া স্বদেশের সম্পদ ও শক্তি বাড়াইয়া তুলিবার যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইউরোপে আরম্ভ হইয়াছিল, ঐ দুইটি যুদ্ধই তাহার বিষময় ফল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ ঃ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার ফলে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধের মনোভাব ক্রমেই তীব্র হইয়া উঠে। বিরোধে জয়ী হইবার বাসনায় তাহারা তাহাদের সামরিক শক্তি বাড়াইয়া তুলিতে যত্নশীল হয়। তাহারা দুইটি প্রধান দলে বিভক্ত হয়। জার্মানী, ইটালী ও অস্ট্রিয়া একটি দলে এবং ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া অপর দলের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই দল বিভাগের তাৎপর্য বুঝিতে হইলে উনবিংশ শতকের শেষের দিকে ইউরোপের রাজনৈতিক ইতিহাসের সহিত কিছু পরিচয় থাকা প্রয়োজন।

ঐ ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ ঘটনা হইতেছে রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মান সাম্রাজ্যের আবির্ভাব। বিসমার্কের অসাধারণ

প্রতিভার ফলেই এই আবির্ভাব সম্ভব হয়। অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সকে পরাজিত করিয়া এবং ক্ষুদ্র জার্মান রাষ্ট্রগুলির আনুগত্য লাভ করিয়া জার্মানী অপরিমেয় শক্তির অধিকারী হইয়া উঠে। স্বাধীনতা ও একতা লাভের ফলে জার্মানীর অধিবাসীদের মধ্যে অপূর্ব উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। তাহারা জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিল্পে ও সামরিক শক্তিতে ইউরোপে অদ্বিতীয় হইয়া উঠে। কিন্তু ইউরোপের শীর্ষস্থানীয় হইয়াও তাহাদের তৃপ্তি হয় না। কাইজার (সম্রাট) দ্বিতীয় **উইলিয়মের** অনুপ্রেরণায় তাহারা সমগ্র পৃথিবীর নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠে। অস্ট্রিয়ার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া তাহারা আপনাদের জনবল বাড়াইয়া তোলে।

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম

তাহারা শিল্পের অসাধারণ উন্নতি করিয়া এবং পৃথিবীর দূরতম দেশে শিল্পদ্রব্য সুলভে বিক্রয় করিয়া তাহাদের ধনবল বৃদ্ধি করে। তুরস্ক প্রভৃতি দেশের সহিত মিত্রতা করিয়া তাহারা পূর্ব ইউরোপে তাহাদের প্রভাব বিস্তার করে। সর্বশেষে তাহাদের নৌ-শক্তি বিস্তৃততর ও দৃঢ়তর করিয়া সমুদ্রপথেও তাহারা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যত হয়।

স্বদেশকে বড় করিবার নেশা ঐ সময় ইউরোপের প্রায় সকল-রাষ্ট্রকেই পাইয়া বসিয়াছিল। সুতরাং জার্মানীর অগ্রগতি দেখিয়া

তাহাদের অনেকেই চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার আচরণে অনেকের মনে ক্ষোভ, এমন কি আশংকার কারণ দেখা দিল।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে পরাজিত হইয়া ফ্রান্স জার্মানীকে দুইটি সমৃদ্ধ অঞ্চল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়, প্রচুর ক্ষতিপূরণও দিতে হয়। পরাজয়ের ফলে ফ্রান্সের মর্যাদা বহু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়া যায়। হারান অঞ্চলগুলি ফিরাইয়া আনা এবং হারান সম্মান পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা সকল দেশভক্ত ফরাসীরই লক্ষ্য হইয়া উঠে।

জার্মানী যে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ন্যায় আবার ফ্রান্সের উপর অভিযান করিবে কিনা তাহারও নিশ্চয়তা ছিল না। সুতরাং ফ্রান্স জার্মানীর শত্রু হইয়া উঠে এবং তাহার সামরিক জীবনকে সুগঠিত ও শক্তিশালী করিয়া তুলিতে আরম্ভ করে।

বহুকাল ধরিয়া ইংলণ্ড ছিল সর্বপ্রধান ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য। ঐ দেশেই সর্বপ্রথম শিল্প-বিপ্লব হইয়াছিল। উহার নৌ-শক্তিও ছিল অতুলনীয়। কিন্তু জার্মানীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে ইংলণ্ডের বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইল, সমুদ্রপথে তাহার একাধিপত্য ক্ষুণ্ণ হইবারও সম্ভাবনা দেখা দিল।

পূর্ব ইউরোপকে গ্রাস করা ছিল রাশিয়ার বৈদেশিক নীতির প্রধান লক্ষ্য, কিন্তু জার্মানী ঐ অঞ্চলে প্রভুত্ব বিস্তার করিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া রাশিয়ার শাসনকর্তারা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

বিভিন্ন বিষয়ে ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও রাশিয়ার মধ্যে স্বার্থের বিরোধ ছিল, কিন্তু তাহারা ঐ বিরোধ মিটাইয়া ফেলিল। তাহারা জার্মানী ও তাহার মিত্র অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে একত্রে কাজ করিবার সংকল্প গ্রহণ করিল এবং সামরিক শক্তি অপরাজেয় করিবার জন্য তাহাদের সকল শক্তি নিয়োজিত করিল। জার্মানীরও অলস রহিল না, সে তাহার স্থল ও নৌ-বাহিনীকে বিস্তৃততর করিয়া উহাকে নূতন অস্ত্রে সজ্জিত

করিয়া তুলিতে লাগিল। উভয় পক্ষের স্বার্থের আঘাত ও অসংযত সমর সজ্জার ফলে যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিল।

অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের কাজের ফলে যুদ্ধ আরও নিকটতর হইয়া উঠে। তিনি দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের দুইটি জনপদ আপনার সাম্রাজ্যের অধীন করিয়া লন। ঐ দুইটি জনপদের অধিবাসীরা ছিল সার্বিয়ার অধিবাসী-দের আত্মীয়। সুতরাং তাহাদের অধীনতায় সার্বিয়ার বিশেষ অসন্তোষ দেখা দিল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে কয়েকজন বিপ্লবী সার্ব (সার্বিয়ার অধিবাসী) অষ্ট্রিয়ার যুবরাজকে নিহত করিয়া অষ্ট্রিয়া সরকারের রাজ্য লিপ্সার প্রতিশোধ লইল। তাহাদের এই ঔদ্ধত্যে অষ্ট্রিয়ার সম্রাট ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি সার্বিয়ার নিকট ক্ষতিপূরণ দাবী করিলেন। ঐ দাবী পূর্ণ করিলে সার্বিয়ার স্বাধীনতা বলিয়া কিছুই থাকিত না। সুতরাং সার্বিয়া দাবী মানিল না। তখন অষ্ট্রিয়া সার্বিয়া আক্রমণ করিল। জার্মানী অষ্ট্রিয়ার পক্ষ সমর্থন করিল ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও রাশিয়া সার্বিয়ার পক্ষ গ্রহণ করিল। এইরূপে বশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঃ যুদ্ধের পরিধি ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। রাশিয়ার সহিত বহুকাল ধরিয়া তুরস্কের শত্রুতা চলিয়া আসিতেছিল। সুতরাং তুরস্ক জার্মানীর পক্ষে যোগ দিল। যুদ্ধ চলিবার কিছুকাল পরে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স প্রভৃতির অনুকূলে ইটালী, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও চীন যুদ্ধে যোগ দেয়। এইরূপে পৃথিবীর প্রায় সকল রাষ্ট্রই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে রাশিয়া এই যুদ্ধ হইতে সরিয়া যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ প্রায় চারি বৎসর স্থায়ী হয়। তবুও ইহার সহিত পূর্ববর্তী কোন যুদ্ধেরই তুলনা হইতে পারে না। পৃথিবীর প্রায় সকল উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রই এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং

ইহার বিভীষিকা কোন একটি বিশেষ দেশ, এমন কি মহাদেশের মধ্যেও নিবদ্ধ থাকে নাই। বিজ্ঞানের সহায়তায় ঐ বিভীষিকা আরও ভয়ঙ্কর, আরও বীভৎস হইয়া উঠিল। স্থল, জল এমন কি অন্তরীক্ষ সমরাঙ্গণে পরিণত হইয়াছিল। ডুবো জাহাজের দল সমুদ্রের অভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়া ধ্বংসলীলা চালাইয়া আবার সমুদ্রের অভ্যন্তরে মিলাইয়া যাইত। অতিকায় কামানের গোলাবর্ষণের ফলে অমোঘ রক্ষা-ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িল। সমৃদ্ধ জনপদ জনহীন শ্মশানে পরিণত করিয়া ট্যাঙ্কের সারি বিদ্যুতের মত ক্ষীপ্রবেগে ছুটিয়া চলিত। বিষ বাষ্পের ধূম্রজাল আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া নিরীহ নরনারীর প্রাণ হরণ করিত। সৈনিকেরা খাদের সংকীর্ণ পরিবেশের মধ্যে মাসের পর মাস কাটাইতে বাধ্য হয়। উড়োজাহাজ হইতে নিক্ষিপ্ত বোমার আঘাতে শ্যামল শস্যক্ষেত্র ভস্মস্তূপে ভরিয়া উঠে, শত শত বৎসরের সভ্যতার নিদর্শন লুপ্ত হয়।

১৫৬৫ দিন যুদ্ধ চলিবার পরে যখন এই ধ্বংসযজ্ঞের সমাপ্তি হইল তখন দেখা গেল ৬ কোটি সৈন্য ইহাতে অংশ লইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ৯০ লক্ষ নিহত এবং ২ কোটি ২০ লক্ষ লোক আহত হয়। যুদ্ধের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ফলে ১ কোটি অসামরিক লোককে প্রাণ হারাইতে হয়, বহু হাজার কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তিও বিনষ্ট হয়।

মানুষের প্রতি অনুকম্পার ফলে কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয় নাই। উহার অবসান হয় অন্য কারণে। বহু শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া জার্মানী ক্লান্ত হইয়া পড়ে। সে বুঝিতে পারে তাহার শক্তি অপেক্ষা বিপক্ষের শক্তি অনেক প্রবল। তারপর তাহার মিত্ররাও তাহার পক্ষ ত্যাগ করিতে থাকে। এই সব কারণে জার্মানী সন্ধির জন্য আবেদন করে। তাহার আবেদনের ফলে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে

১১ই নভেম্বর যুদ্ধের অবসান হয়। যুদ্ধ বিরতির দিন বলিয়া ঐ দিনটি এখনও উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে।

ভার্সাই সন্ধিঃ যুদ্ধ বিরতির পরে মিলিত পক্ষের রাষ্ট্র-নায়কদের চিন্তার বিষয় হইল জার্মানীর সহিত কিরূপ সন্ধি করা হইবে। বহু সভার অধিবেশন হইল। শেষে ভার্সাইয়ে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। সন্ধির মূলনীতি হইল, প্রত্যেক জাতি স্বাধীনতা লাভ করিবার অধিকারী। এই নীতির প্রয়োগের ফলে ইউরোপের মানচিত্র বহু পরিমাণে পরিবর্তিত হইল। অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া উহার অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি অধীন জাতিকে স্বাধীন করিয়া দেওয়া হইল; ফলে হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রের আবির্ভাব হইল। স্বাধীনতার মহান আদর্শ কিন্তু সর্বত্র প্রযুক্ত হইল না। ইংরেজ, ফরাসী ও জাপানী সাম্রাজ্যের অধীনে বহু জাতি পূর্বেরই মত পড়িয়া রহিল।

জার্মানীর রাজ্যসীমা বহু পরিমাণে কমাইয়া দেওয়া হইল। তাহার উপনিবেশগুলি তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লওয়া হইল, তাহার উপর ক্ষতিপূরণের তুর্বহ ভার চাপাইয়া দেওয়া হইল। ভার্সাই সন্ধিতে ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করা হয় নাই। জার্মানীর প্রতি বিন্দুমাত্র সদয় ব্যবহারও করা হয় নাই। তাহাকে চিরকালের জন্য শক্তিহীন করিয়া রাখাই ছিল ঐ সন্ধির উদ্দেশ্য। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। সন্ধির কঠোরতা উহার অধিবাসীগণের মন তিক্ততায় ভরিয়া তোলে। তাহাদের প্রতি এই অন্যায়ের প্রতিশোধ লইবার অভিপ্রায়ে তাহারা সুসময়ের প্রতীক্ষা করিতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অনেক পরিমাণে তাহাদের এই অভিপ্রায়েরই অপরিহার্য ফল।

জাতিসংঘঃ জার্মানীর শত্রুরা ছিল জার্মানীর মতই সাম্রাজ্য-বাদী, কিন্তু ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ একজন ছিলেন, যিনি স্বাধীনতা ও

শান্তির মূল্য বুঝিতেন। তিনি হইলেন যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি উইলসন। উইলসন চাহিয়াছিলেন সকল জাতিকে স্বাধীনতার অধিকারী করিতে, কিন্তু ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্রের চাপে পড়িয়া তিনি ঐ আদর্শ রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহার আর একটি স্বপ্ন ছিল, পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রাতষ্ঠা করা। এই স্বপ্ন সফল করিবার উদ্দেশ্যে তিনি জাতিসংঘ (League of Nation) এর পরিকল্পনা করেন। ভার্সাইর রাষ্ট্রনায়কেরা এই পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ফলে জাতিসংঘের জন্ম হয়।
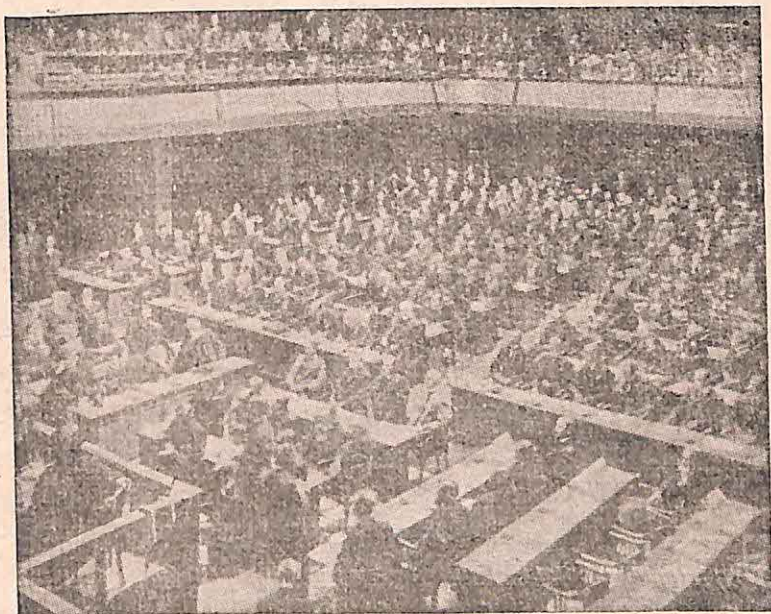
জাতিসংঘের অধিবেশন

প্রথমে জার্মানীর বিরুদ্ধে যাহারা যুদ্ধ করিয়াছিল অথবা ঐ যুদ্ধে যাহারা নিরপেক্ষ ছিল তাহারা এই জাতিসংঘের সভ্য হইবার যোগ্য বিবেচিত হয়। পরে বিজিত জাতিগুলিও উহার সভ্য হইবার

অধিকার লাভ করে। যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘে কখনও যোগ দেয় নাই। জাপান, ইটালী ও জার্মানী উহার সভ্যপদ গ্রহণ করে, কিন্তু পরে তাহারা উহার বাহিরে চলিয়া যায়।

জাতিসংঘের অধিবেশন হইত চিরনিরপেক্ষ সুইট্‌জারল্যাণ্ড-এর জেনিভা নগরীতে। বিশ্ববিচারালয় নামে জাতিসংঘের একটি শাখা ছিল। ঐ শাখার অধিবেশন হইত হল্যাণ্ডের হেগ নগরে। ঐ বিচারালয়ের কাজ ছিল বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে আইনের ব্যাখ্যা লইয়া মতান্তর হইলে উহার বিচার করা।

জাতিসংঘের আদর্শ ছিল আন্তর্জাতিক বিরোধ উপস্থিত হইলে পারস্পরিক আলাপ ও আলোচনার সাহায্যে ঐ বিরোধের মীমাংসা করা। ইহার চেষ্টায় কয়েকটা ছোটখাট রাজনৈতিক বিরোধের অবসানও হইয়াছিল। কিন্তু কোন শক্তিশালী রাষ্ট্রই ইহার নির্দেশে কোন গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ ত্যাগ করিতে সম্মত হয় নাই। ঐ নির্দেশ কার্যকরী করিবারও ইহার শক্তি ছিল না। ইহার নিষেধ অমান্য করিয়া ইটালী অবাধে আবিসিনিয়া আক্রমণ করে। ইটালীর এই উপেক্ষার ফলে জাতিসংঘের লোকপ্রিয়তা একান্ত দুর্বল হইয়া যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে ইহার অস্তিত্বের আর সন্ধান পাওয়া যায় না।

মুসোলিনী ও ইটালী: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে মানুষকে যে অশেষ দুঃখ সহ্য করিতে হইয়াছিল, আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ভার্সাইয়ের সন্ধিতে ঐ দুঃখের অবসান হয় নাই, বরং উহার একাধিক অন্যায় বিধানের ফলে কয়েকটি দেশের অধিবাসীদের দুর্দশা আরও তীব্র হইয়া উঠে। এই অবস্থায় তাহাদের অনেকে বিচারশক্তি হারাইয়া ফেলে। এই সুযোগে অনেকে শুভদিন আনিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহাদের চিত্ত জয় করিয়া লয়। এইভাবেই মুসোলিনী নামে

একজন নেতা ইটালীর জনসাধারণের উপর আপনার প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া ঐ দেশের শাসনক্ষমতা লাভ করেন।

মুসোলিনী ছিলেন ফ্যাসিস্ট দলের অধিনায়ক। ঐ দলের আদর্শ ছিল প্রাচীন রোমক যুগের ন্যায় ইটালীকে পুনরায় সম্পদ, শক্তি ও সংস্কৃতিতে ইউরোপের শীর্ষস্থানীয় করা। এই আদর্শ অনুসরণ করিতে গিয়া মুসোলিনী অপর দেশের স্বাধীনতা হরণ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি কতকগুলি সংস্কার সাধিত করিয়া ইটালীর অধিবাসীদের অবস্থার উন্নতি করেন। কিন্তু তিনি একটি বিরাট সৈন্যবাহিনী সৃষ্টি করিতে গিয়া ইটালীর সম্পদের অপব্যয় করেন। তাঁহার প্রভাব নিরঙ্কুশ করিবার জন্য তিনি জনসাধারণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকেও ক্ষুণ্ণ করেন। তাঁহার এই সব কাজের ফলে ইটালীর অধিবাসীদের জীবন অবশেষে দুর্বহ হইয়া উঠে।

মুসোলিনী

হিটলার ও জার্মানী : জার্মানীতেও ফ্যাসিস্ট দলের অনুরূপ একটি দল ক্রমেই প্রভাবশালী হইয়া উঠে। এই দলের সভ্যগণকে বলা হইত নাৎসী। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে নাৎসী নেতা হিটলার জার্মানীর শাসন ক্ষমতা অধিকার করেন। হিটলারের লক্ষ্য ছিল ভার্সাইয়ের রাষ্ট্রব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন করিয়া ইউরোপে জার্মানীর প্রাধান্য ফিরাইয়া আনা। হিটলার জানিতেন যুদ্ধ ভিন্ন তাঁহার লক্ষ্য সফল হইবে না। তাই জার্মানীর শাসন-ক্ষমতা লাভ করিয়া, তিনি নূতন

একটি যুদ্ধের জন্য তাঁহার স্বদেশবাসীদের প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

মুসোলিনীর সহিত মিত্রতা করিয়া তিনি জার্মানীর শক্তি বাড়াইয়া তুলিলেন। তাঁহার কাজের ফলে ইউরোপ আসন্ন যুদ্ধের সম্ভাবনায় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ইউরোপীয় রাষ্ট্র-নায়কদের দুশ্চিন্তার সুযোগ লইয়া জাপানও সুদূরপ্রাচ্যে সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে উদ্যোগী হইয়া উঠিল।

হিটলার

মুসোলিনীর সহিত মিত্রতা করিয়াই হিটলার তৃপ্ত রহিলেন না। তিনি জার্মানীর সামরিক শক্তিকে দৃঢ়তর করিয়া তুলিলেন। যখন তিনি বুঝিলেন ঐ শক্তি চূর্ণ করা কোন শত্রুর পক্ষেই সম্ভব হইবে না, তখন তিনি উহার সাহায্যে জার্মানীর রাজ্যসীমা বাড়াইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি অষ্ট্রিয়া অধিকার করিয়া উহাকে জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করিলেন। তিনি চেকোস্লাভাকিয়ার ধ্বংস সাধন করিতেও দ্বিধা করিলেন না।

হিটলার ও তাঁহার নাৎসী অনুবর্তীরা যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে, এই কথা রাশিয়া একাধিকবার ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতিকে বুঝাইতে চেষ্টা করে এবং তাহাদের সহিত একটি আত্মরক্ষামূলক মৈত্রী চুক্তিরও প্রস্তাব করে। কিন্তু উহারা রাশিয়ার কথায় কান দেয় না। ফলে রাশিয়া বিরক্ত হইয়া জার্মানীর সহিত একটি চুক্তি করে। ইহার সর্ত হইল জার্মানী রাশিয়াকে আক্রমণ করিবে না, রাশিয়াও জার্মানীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে না।
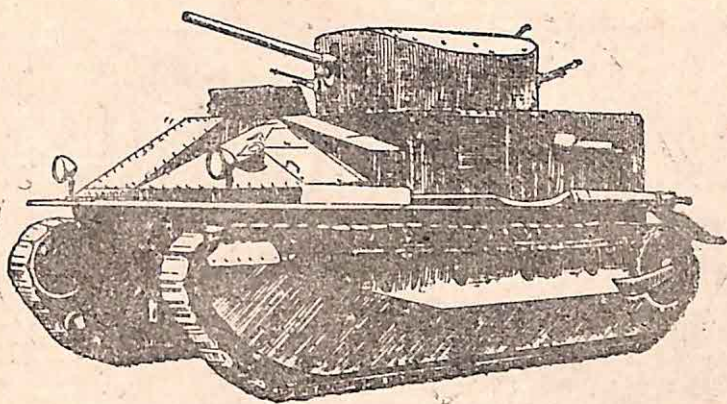
ট্যাঙ্ক

জার্মান ট্যাঙ্ক বাহিনী
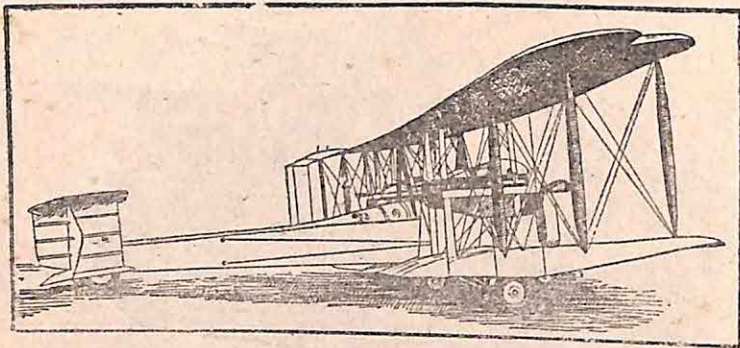
প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত বোমারু বিমান
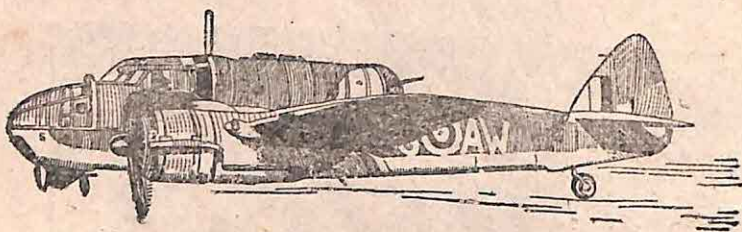
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত বোমারু বিমান
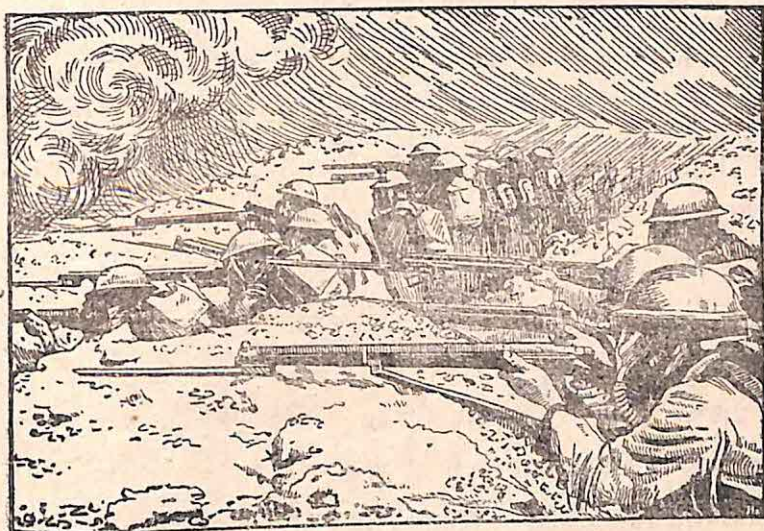
গ্যাস-মুখোস পরিহিত পরিখার মধ্যে যুদ্ধরত সৈনিকগণ
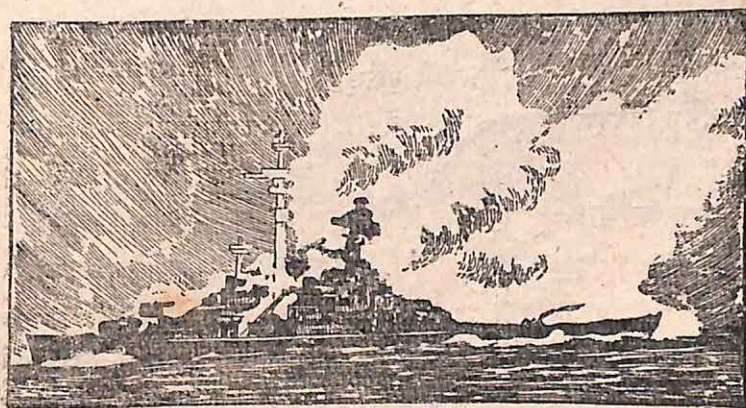
জার্মান 'ইউ-বোট' বা ডুবো জাহাজ (সাবমেরিন)

রাশিয়ার সহিত অনাক্রমণ চুক্তি করিতে পারায় জার্মানীর পূর্ব সীমান্ত নিরাপদ হয়। ফলে হিটলারের আক্রমণ ক্ষমতা বহুগুণে বাড়িয়া যায়। তিনি ঐ ক্ষমতা কাজে লাগাইতে বিলম্ব করেন না, পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিয়া তিনি উহার পরিচয় দেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঃ পোলাণ্ড আক্রমণের ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধ ছয় বৎসরকাল স্থায়ী হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলাকেও ছাড়াইয়া যায়।

যাহাদিগকে লইয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এক পক্ষের প্রধান ছিল জার্মানী ও ইটালী, অন্যপক্ষে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল ইংলণ্ড ও ফ্রান্স। কিছুকাল পরে যুক্তরাষ্ট্র ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পক্ষ গ্রহণ করে। যুদ্ধ চলিবার দুই বৎসর পরে জাপান জার্মানীর পক্ষে যোগ দেয়। অনাক্রমণ চুক্তি সত্ত্বেও রাশিয়ার সহিত জার্মানীর মনান্তর আরম্ভ হয়। শেষে জার্মানী রাশিয়া আক্রমণ করে, তখন রাশিয়া ইংলণ্ড প্রভৃতির পক্ষ গ্রহণ করে।

এতগুলি জাতির যুদ্ধে যোগদানের ফলে যুদ্ধক্ষেত্রের পরিধি ক্রমেই বিস্তৃত হয়। রাশিয়াসহ সমগ্র ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা, পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপাবলী যুদ্ধভূমিতে পরিণত হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অপেক্ষাও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যন্ত্রসজ্জার প্রভাব বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। ট্যাঙ্ক আরও ভয়াবহ, কামান আরও অতিকায়, ডুবো জাহাজ আরও ক্ষিপ্রগতি, আরও ধ্বংসকারী হয়। ইহাদের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। উড়ো জাহাজে সংখ্যা, শক্তি ও ক্ষিপ্রতা কল্পনাকেও অতিক্রম করে। ইহাদের ভূমিকা ক্রমেই অধিক হইতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হইতে থাকে। ইহাদের সাহায্যে হিটলার ইংলণ্ডের রক্ষা-ব্যবস্থা চূর্ণ করিয়া ঐ দেশ অধিকার করিবার কল্পনা করেন। আবার ইংলণ্ড ইহাদের সাহায্যেই অভিযানের আয়োজন বিনষ্ট করিয়া

উহার ঐ পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে। উড়ো জাহাজের সাহায্যে জার্মানী রাশিয়ার স্টালিনগ্রাড নগর ধ্বংস করিয়া রাশিয়া জয়ের উদ্যম করে এবং ঐ উদ্যমকে সফলপ্রায় করিয়া তোলে। উড়ো জাহাজ হইতে বোমা বর্ষণ করিয়া জাপানীরা যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবহরকে অকেজো করিয়া সুদূর প্রাচ্যে তাহাদের প্রভুত্বের পথ সুগম করিয়া তোলে। উড়ো জাহাজ হইতে বোমা বর্ষণ করিয়া মিত্রপক্ষ জার্মানীর সমর সম্ভার ধ্বংসপ্রায় করিয়া এবং জার্মান রাজধানী বার্লিনের জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত করিয়া হিটলারের পরাজয়কে ত্বরান্বিত করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে স্থল, জল ও অন্তরীক্ষ সমভাবে সমরাঙ্গণে পরিণত হয়। সুতরাং ঐ যুদ্ধ পরিচালনা করিতে এবং উহার প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রস্তুত করিতে প্রত্যেক যুদ্ধশীল রাষ্ট্রকেই তাহার সকল শক্তি ও সম্পদ নিয়োজিত করিতে হয়। অসামরিক অধিবাসীদের সহযোগিতা তাহাদের পক্ষে অপরিহার্য হইয়া উঠে। ইহাদিগকে যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুত করিতে, সরকারী কাজ করিতে এবং কারখানা চালু রাখিতে নিযুক্ত করা হয়। এইসব কাজে অধিকৃত দেশের অধিবাসীদেরও নিয়োজিত করা হয়। ইহাদিগকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিবিরে রাখা হয়। এবং দুর্ভাগ্যময় বন্দী জীবন যাপন করিতে বাধ্য করা হয়। যাহারা দেশ অধিকারে বাধা দিয়াছিল, তাহাদিগকে আরও অসহনীয় জীবনযাপন করিতে হয়। শত্রুপক্ষের অসামরিক অধিবাসিগণকেও ক্রীতদাসের পর্যায়ে নামাইয়া আনা হয়।

যুদ্ধের গতি : যুদ্ধের প্রথমদিকে জার্মান পক্ষেরই জয় হয়। হিটলার ইংলণ্ড, রাশিয়া ভিন্ন ইউরোপের প্রায় সকল দেশেই আপনার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। জাপানও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জয় করিয়া

ভারতের পূর্ব সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হয়। হিটলারের দিগ্বিজয়ের ফলে রাশিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে এবং ইউরোপের কতকগুলি অঞ্চল দাবী করে। হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করেন। জার্মান সৈন্যবাহিনী রাজধানীর নিকটে গিয়া উপনীত হয়, কিন্তু রুশদের প্রতিরোধ চূর্ণ করা সম্ভব হইল না। জার্মান বাহিনীকে পরাজয় বরণ করিয়া রাশিয়া ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে হইল। রুশবাহিনী পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ করিল এবং জয়ের পর জয়লাভ করিয়া জার্মানীতে প্রবেশ করিল।

ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এবং যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি রুজভেল্টের অনমনীয় দৃঢ়তার ফলে মিত্রশক্তির মনে নূতন আশা ও উদ্দীপনার

রুজভেল্ট

উইনস্টন চার্চিল

সঞ্চার হইল। এই আশা ও উদ্দীপনার ফলে অন্যান্য রণাঙ্গনেও যুদ্ধের গতি ফিরিয়া গেল। আফ্রিকায় জার্মানীর পরাজয় হইল। আফ্রিকা হইতে মিত্রপক্ষীয় বাহিনী আসিয়া ইটালী আক্রমণ করিল।

জাপানও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপমালায় একাধিকবার পরাজিত হইল। চীন জয় করাও তাহার পক্ষে সম্ভব হইল না। যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ড জাপানের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ করিয়া হারানো

অঞ্চলগুলি আবার জয় করিয়া লইতে লাগিল। পশ্চিম ইউরোপে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্র নূতন করিয়া অভিযান আরম্ভ করিয়া বিজিত দেশগুলি পুনরায় অধিকার করিল এবং শেষে জার্মানীর অভ্যন্তরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইটালীতে মিত্র পক্ষের অগ্রগতি রোধ করা মুসোলিনীর পক্ষে অসম্ভব হইল। ফলে তাঁহার প্রভাব বিনিষ্ট হইল, তাঁহাকে প্রাণ পর্যন্ত হারাইতে হইল। ইটালীর নূতন সরকার মিত্রপক্ষের সহিত সন্ধি করিল। এদিকে সকল প্রতিরোধ চূর্ণ করিয়া রুশবাহিনী বার্লিনে প্রবেশ করিল। হিটলার পরাজয় অনিবার্য বুঝিয়া আত্মহত্যা করিলেন। জার্মানী মিত্রপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিল।

জাপানও বেশীদিন যুদ্ধ চালাইতে পারিল না। যুক্তরাষ্ট্রের উড়োজাহাজ হইতে নিক্ষিপ্ত একটি আণবিক বোমা হিরোসিমা নগরীকে জনহীন শ্মশানে পরিণত করিল। ইহার দুইদিন পরে রাশিয়া তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া তাহার সংকট আরও ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিল। পরদিন আর একটি আণবিক বোমার আঘাতে সমৃদ্ধ নাগাসকী নগর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইল। জাপান বুঝিল যুদ্ধ চালান তাহার পক্ষে বাতুলতার সমতুল্য। পাঁচ দিন পরে সম্রাট বিনাসর্তে মিত্রপক্ষের নিকট জাপানের আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পাঠাইলেন। এইরূপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হইল।

বিশ্বযুদ্ধ শেষ হইল তবুও শান্তি আসিল না, আসিল নূতন নূতন বিরোধ। বিরোধ উপস্থিত হইল মিত্রপক্ষের সদস্যদের মধ্যেই। ঐ সব বিরোধের ফলে এখনও চূড়ান্ত সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইতে পারে নাই। ভারতবর্ষ প্রমুখ অল্প কয়েকটি রাষ্ট্র নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করিতেছে। কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রই দুইটি পরস্পর প্রতিকূল গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের

একটিকে বলা হয় **পূর্ব গোষ্ঠী**; রাশিয়া ইহার নেতা। অপরটিকে বলা হয় **পশ্চিম গোষ্ঠী**; ইংলণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্র ইহার সর্বপ্রধান সভ্য। পূর্ব গোষ্ঠীতে বলশেভিক আদর্শ এবং বলশেভিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রচলিত, পশ্চিম গোষ্ঠীর সভ্যরা ঐ আদর্শের বিরোধী। তাহাদের ধারণা উহা কার্যকরী হইলে স্বাধীনতার বিনাশ হইবে।

সম্মিলিত জাতি সংগঠনঃ উল্লিখিত দুইটি গোষ্ঠীর আদর্শ ও স্বার্থের সংঘাতের ফলে আরও একটি মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা ইতিমধ্যে দেখা দিয়াছে। কিন্তু এই যুদ্ধ সম্ভব হইলেও অনিবার্য নহে। এখনও আন্তর্জাতিক আলাপ-আলোচনার পথ খোলা আছে। এখনও এমন একটি প্রতিষ্ঠান আছে, যাহার সহায়তায় ঐ আলাপ-আলোচনা চলিতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানটির নাম সম্মিলিত জাতি সংগঠন (United Nations Organisation)। ইহাকে সংক্ষেপে বলা হয় য়ুনো (U. N. O.)

য়ুনোর আবির্ভাব হইয়াছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে। জাতিসংঘের উত্তরাধিকারীরূপে মিত্রপক্ষের উদ্যোগের ফলেই ইহার ঐ আবির্ভাব সম্ভব হয়। একটি সনদের উপরে য়ুনো প্রতিষ্ঠিত। ঐ সনদে কতকগুলি অধিকার প্রত্যেক জাতিরই প্রাপ্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

পৃথিবীর অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্র য়ুনোর সদস্য। স্বাধীন ভারতবর্ষ ইহার একজন বিশিষ্ট সভ্য এবং ইহার প্রধান কর্তব্য পালনের সক্রিয় সহায়ক। এই কর্তব্য হইল আন্তর্জাতিক শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখা। জাতিসংঘ অপেক্ষা য়ুনোর হাতে অনেক বেশী ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ইহার চেষ্টায় কতকগুলি বিরোধেরও মীমাংসা হইয়াছে। অনেকক্ষেত্রে ন্যায়ের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার অকৃত্রিম অভিপ্রায়েরও পরিচয় য়ুনো দিয়াছে।

য়ুনোর একাধিক শাখা প্রতিষ্ঠান আছে। উহাদের মধ্যে বিশেষ

উল্লেখযোগ্য হইতেছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংগঠন (United Nations' Educational Scientific and Cultural Organisation—U. N. E.S. C. O.) এবং বিশ্বস্বাস্থ্য সংগঠন (World Health Organisation—W.H.O.)
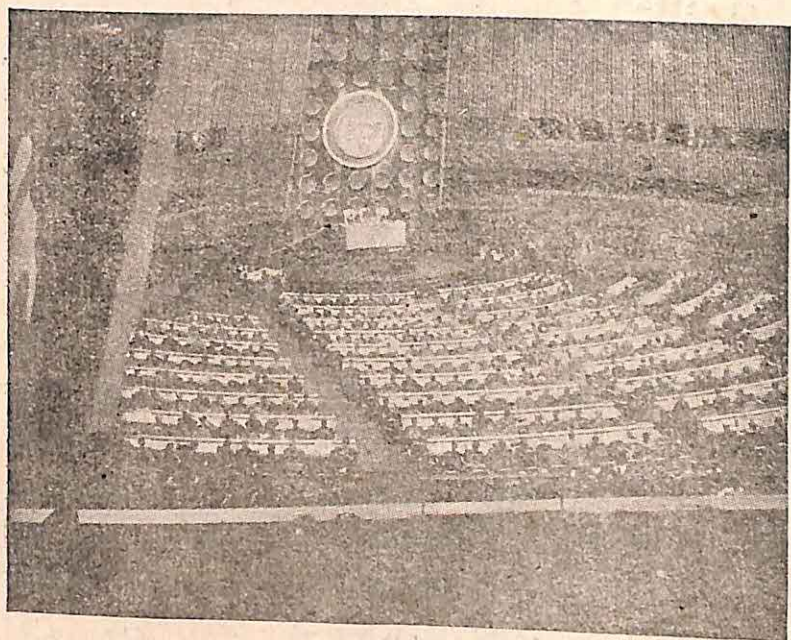
সম্মিলিত জাতিসংঘের অধিবেশন

এইসব প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে বিভিন্ন রাষ্ট্র সম্মিলিতভাবে তাহাদের শিক্ষা, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য প্রভৃতির উন্নতি সাধন করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছে।

কালপঞ্জী

খৃঃ ১৮৮৮	কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মের সিংহাসনারোহণ
খৃঃ ১৯১৪—১৯১৮	প্রথম বিশ্বযুদ্ধ
খৃঃ ১৯১৮ (১১ই নভেম্বর)	যুদ্ধ বিরতি দিবস

খৃঃ	১৯২০	জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা
খৃঃ	১৯২২—১৯২৭	মুসোলিনীর ক্ষমতা লাভ
খৃঃ	১৯৩৪	হিটলারের ক্ষমতা লাভ
খৃঃ	১৯৩৯—১৯৪৫	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ
খৃঃ	১৯৪৬	য়ুনোর প্রথম অধিবেশন

অনুশীলনী

১। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের কারণ বিশ্লেষণ কর।

২। জার্মানীর সহিত কি কি কারণে ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও রাশিয়ার বিরোধ হয়?

৩। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের ধ্বংসলীলার সংক্ষিপ্ত আভাষ দাও।

৪। ভার্সাই-র সন্ধির সর্তগুলির উল্লেখ কর।

৫। ভার্সাই-র সন্ধির সহিত দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের কি কোন সম্পর্ক আছে।

৬। কি অবস্থায় মুসোলিনী ইটালীতে আপনার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন?

৭। মুসোলিনীর শাসনে ইটালীর অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল?

৮। কি অবস্থার ফলে হিটলার জার্মানীর শাসন ক্ষমতা লাভ করেন?

৯। হিটলারের কার্যক্রম সংক্ষেপে বর্ণনা কর এবং উহার ফলে যে দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ আরম্ভ হয় তাহা সপ্রমাণ কর।

১০। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের ধ্বংসলীলা কি কারণে প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের ধ্বংস-লীলাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছিল?

১১। জাতি সংঘের কি আদর্শ ছিল? ঐ আদর্শ কতদূর সফল হইয়াছিল?

১২। য়ুনোর আবির্ভাব কোন সময় হয়? উহার লক্ষ্য কি? তাহার কয়েকটি শাখা প্রতিষ্ঠানের নাম কর।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভারত এবং অন্যান্য ঔপনিবেশিক দেশের স্বাধীনতা লাভ—চীনের বিপ্লব

আমরা এশিয়া ও আফ্রিকায় ইউরোপীয়দের প্রভুত্ব বিস্তারের কথা উল্লেখ করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি, তাহারা ঐ দুই মহাদেশের প্রায় সকল অংশেই তাহাদের আধিপত্য অথবা প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু তাহাদের সাম্রাজ্যবাদের আঘাতে বহু অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ফিরিয়া আসে। আমরা চীন ও জাপানের এই নবজাগরণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছি। এই অধ্যায়ে আমরা ভারতবর্ষ ও অপরাপর ঔপনিবেশিক দেশের অধিবাসীরা কি ভাবে বৈদেশিক অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করে তাহার কথা বলিতেছি। বিভিন্ন জাতির মুক্তি সংগ্রামের মধ্যে ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামই বিশেষ-ভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং গৌরবময়। সুতরাং ভারতীয়েরা কি ভাবে বৈদেশিক নাগপাশ ছিন্ন করিল আমরা প্রথমে সেই কথা বলিতেছি।

ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামঃ ইংরেজদের পূর্বে বহু বৈদেশিক জাতি এদেশে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, কিন্তু গ্রামবাসীরা অনেক সময়েই উহাদের প্রভাব অনুভব করে নাই। তাহারা নিজেরাই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈয়ারি করিয়া তাহাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়াছে। বাহিরের সহিত বিশেষ সম্পর্ক রাখে নাই। কিন্তু ইংরেজশাসনে তাহাদের এই স্বয়ংসম্পূর্ণতা বিনষ্ট হইল। বিদেশী শিল্পের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে তাহাদের কুটির-শিল্প ভাঙ্গিয়া গেল। তাহাদের সমাজ-ব্যবস্থা পর্যন্ত বিপর্যস্ত হইল। অপরদিকে ইংরেজ-শাসনের প্রয়োজনে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হইল। সরকারী কেরাণী, বিভিন্ন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী এবং ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক প্রভৃতি লইয়া এই শ্রেণী গঠিত হইল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা

পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিয়া উহার আলোকে ভারতীয় সমাজ সংস্কারে মন দিল। কিন্তু তাহাদের এই প্রয়াস সফল হইল না। ক্রমে তাহারা বুঝিতে পারিল তাহাদের সংকল্প সফল করিতে হইলে ভারতবর্ষের শাসন পরিচালনায় তাহাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তাহাদের এই অনুভূতির ফলে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় মহাসভা (Indian National Congress) প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রথমে কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের আশা ও আকাঙ্ক্ষার সহিত সরকারকে পরিচিত করা এবং প্রয়োজন হইলে সরকারের কাজের সমালোচনা করা। কংগ্রেসের যাহারা প্রথমে নেতৃত্ব করেন তাঁহাদের মধ্যে প্রধান হইলেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দাদাভাই নৌরজী, গোপালকৃষ্ণ গোখলে প্রভৃতি। ইঁহারা প্রথমে ইংরেজদের সততার প্রতি আস্থাশীল ছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহারা দেখিলেন ইংরেজ সরকার তাঁহাদের সকল গুরুত্বপূর্ণ দাবী অগ্রাহ্য করিতেছে তখন তাঁহাদের ঐ আস্থা ক্রমেই দুর্বল হইতে লাগিল।

ইংরেজ সরকারের ঐ মনোভাবের ফলে কংগ্রেসের মধ্যে চরমপন্থীদের প্রভাব বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। চরমপন্থীদের মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় হইতেছেন মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলক, বঙ্গদেশের বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ এবং পঞ্জাবের লালা লাজপত রায়। বড়লাট লর্ড কার্জনের অবিবেচনার ফলে চরমপন্থীরা তাঁহাদের প্রভাব আরও বাড়াইবার সুযোগ পাইলেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জন শাসনকার্যের সুবিধার অজুহাতে বঙ্গদেশকে দুইভাগে বিভক্ত করেন। একটির নাম হয় পূর্ববঙ্গ ও অপরটি নাম পশ্চিমবঙ্গ। তাঁহার এই কাজের ফলে বঙ্গদেশের উভয় অংশেই তীব্র আন্দোলন আরম্ভ হইল। বাঙ্গালীরা বলিল,

লর্ড কার্জনের আসল উদ্দেশ্য হইতেছে তাহাদের জাতীয় সংহতি বিনষ্ট করিয়া তাহাদিগকে চিরদিনের মত পঙ্গু করিয়া রাখা। এই সম্ভাবনা দূর করিতে তাহারা কৃতসংকল্প হইল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাহাদের প্রাণের কথা গীত হইল—

"বাঙ্গালীর প্রাণ, বাঙ্গালীর মন
বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।"

এই একতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাহারা সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইল। তাহারা সুচারু বিলাতী শিল্পদ্রব্য পরিহার করিয়া দেশী শিল্পের উন্নয়নে মন দিল, অতিসূক্ষ্ম বিলাতী কাপড় ছাড়িয়া 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' মাথায় তুলিয়া লইল, নিষিদ্ধ সভা ও নিষিদ্ধ শোভাযাত্রায় যোগ দিয়া পুলিশের নির্মম আঘাত সহ্য করিল, শত লাঞ্ছনা সত্ত্বেও বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে তাহারা চারিদিক মুখরিত করিয়া তুলিল। তাহাদের এই নির্ভীক আইন অমান্য দেখিয়া ইংরেজ প্রভুরা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। দেশের উপরে নামিয়া আসিল নির্যাতনের অবারিত প্রবাহ। তবুও বাঙ্গালী মাথা নত করিল না। চরমপন্থী নেতারা কংগ্রেসের মাধ্যমে আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন। আর তরুণ দেশসেবকেরা অনুসরণ করিতে লাগিল বিপ্লবের গোপন পথ। ক্ষুদিরাম ছিলেন ইঁহাদের একজন। তিনি একজন অত্যাচারী ইংরেজ রাজপুরুষকে নিহত করিতে গিয়া ভুলিয়া আর একজন ইংরেজকে নিহত করেন। এই কাজের ফলে তাঁহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। তিনি হাসিমুখে মৃত্যু বরণ করিয়া আপনাকে বিপ্লবীদের নিকট চিরস্মরণীয় করিয়া তোলেন। ইংরেজ শাসনকর্তারা যখন বুঝিলেন উৎপীড়নের দ্বারা বাঙ্গালীর মনোবল চূর্ণ করা সম্ভব হইবে না, তখন তাঁহারা লর্ড

কার্জনের আদেশ প্রত্যাহার করিলেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রহিত হইল। এইরূপে বাঙ্গালীর জয়যাত্রার প্রথম পদক্ষেপ জয়যুক্ত হইল।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন আরও প্রাণবন্ত হইয়া উঠে। দেশবাসীর মধ্যে ঐ সময় রাজনৈতিক চেতনা পূর্বাপেক্ষাও গভীর ও ব্যাপক হয়। ঐ সময় মহাত্মা গান্ধী আসিয়া ঐ চেতনাকে একটি নূতন পথে পরিচালিত করেন। ভারতবর্ষে আসিবার পূর্বে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকারের নিষ্ঠুর নিপীড়নের বিরুদ্ধে কৃষ্ণকায় ভারতীয়দের পক্ষ লইয়া সংগ্রাম করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সংগ্রামের নাম ছিল **সত্যাগ্রহ**। যে সত্যাগ্রহ করিতে তাঁহাকে সত্য ও ন্যায়ের প্রতি অচল নিষ্ঠা রাখিয়া শান্ত এবং অহিংসভাবে উৎপীড়ন সহ্য করিয়া উৎপীড়নকারীর চিত্ত জয় করিতে হইত, ভারতবর্ষে আসিয়া তিনি এই দেশের বহু অধিবাসীকে সত্যাগ্রহে দীক্ষিত করিয়া কংগ্রেস আন্দোলনকে নির্ভীক গণ-আন্দোলনে পরিণত করিলেন।

তিনি দুইবার ঐরূপ আন্দোলন পরিচালনা করেন, একবার ১৯২০ খৃষ্টাব্দে, আর একবার ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে। দুইটি আন্দোলনেরই লক্ষ্য ছিল অধীনতা পাশ হইতে ভারতকে মুক্ত করা। দুইটি আন্দোলনের ফলেই দেশের সর্বত্র গভীর উৎসাহের সঞ্চার হয়। মুসলমানেরা তুরস্কের সুলতানকে তাহাদের খলিফা বা ধর্মগুরু বলিয়া মনে করিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে খলিফা জার্মানীর পক্ষ গ্রহণ করেন। এই অপরাধে ঐ যুদ্ধের শেষে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তাঁহার সাম্রাজ্যের অনেক অংশ কাড়িয়া লয়। তাঁহাকে সিংহাসন পর্যন্ত হারাইতে হয়। খলিফার প্রতি এই আচরণের ফলে মুসলমানেরা ইংরেজদের প্রতি ভীষণ বিরক্ত হইয়া উঠে এবং দলে দলে ১৯২০ খৃষ্টাব্দের কংগ্রেস আন্দোলনে যোগ দেয়।

১৯২০ ও ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের আন্দোলন ছিল অহিংস। উভয় আন্দোলনেরই সরকারী প্রতিষ্ঠান পরিহার করিবার এবং অবাঞ্ছিত আইন অমান্য করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। অগণিত লোক এই সব নির্দেশ পালন করিয়া নির্ভয়ে কারাবরণ করে। মহাত্মা গান্ধী নিজে লবণের উপরে শুল্কের প্রতিবাদে ঐ আইন অমান্য করিবার আন্দোলন আরম্ভ করেন। দেশের বিভিন্ন অংশে হাজার হাজার লোক লবণ আইন ভঙ্গ করিতে গিয়া অসহ্য উৎপীড়ন বরণ করে। অনেক জায়গায় লোকেরা সরকারকে কর দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে। সরকার চণ্ডনীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। সরকারী কারাগারগুলি স্বাধীনতার নির্ভীক সৈনিকে পূর্ণ হইয়া উঠে।

মহাত্মা গান্ধী

১৯২০ খৃষ্টাব্দে আন্দোলনটি শেষ পর্যন্ত অহিংসার আদর্শ অনুসরণ করিতে পারে নাই। সরকারী অত্যাচারে আত্মহারা হইয়া কতকগুলি আন্দোলনকারী হিংসার আশ্রয় লয়। তাহাদের এই অসংযমের ফলে মহাত্মা গান্ধী ঐ আন্দোলন বন্ধ করিয়া দেন। সরকারী চণ্ডনীতির ফলে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের আন্দোলন সাময়িকভাবে দমিত হয়। কিন্তু উভয় আন্দোলনই অসংখ্য ভারতীয়কে স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়া উহার জয়যাত্রাকে ত্বরান্বিত করে।

উল্লিখিত উভয় আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বৈপ্লবিক আন্দোলনও সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। কয়েকজন বিপ্লবী নেতা বিদেশে পলাইয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারা ইংরেজদের শত্রুদের সাহায্য লাভ করিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিপ্লবের আয়োজন করেন। তাঁহাদের পরিকল্পনা সফল হয় নাই। কিন্তু ঐ সব পরিকল্পনা

কার্যকরী করিতে গিয়া যাঁহারা ইংরেজদের হাতে প্রাণ দেন, তাঁহাদের দুঃসাহস ও আত্মত্যাগ ভারতীয়দের স্বাধীনতা লাভের সংকল্পকে পূর্বাপেক্ষাও সুদৃঢ় করিয়া তোলে।

চণ্ডনীতির সাহায্যে হিংস ও অহিংস আন্দোলন সাময়িকভাবে দমিত করিতে সমর্থ হইলেও, ইংরেজেরা শুধু ঐ নীতি উপরই নির্ভর করিতে পারে নাই। তাহারা জানিত দেশবাসীর শুভ ইচ্ছার উপরে প্রতিষ্ঠিত না হইলে কোন শাসনই স্থায়ী হইতে পারে না। ঐ শুভ-ইচ্ছা লাভ করিবার আশায় তাহারা ভারতবাসীদিগকে দেশ শাসনে কিছু কিছু অধিকার দিতে সম্মত হয়। এই উদ্দেশ্যে তাহারা ১৯০৯, ১৯১৯ এবং ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ভারত শাসন-আইনের সংস্কার সাধন করে। কিন্তু ঐ সব সংস্কার ভারতবাসীর হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাহাদের মনে ইংরেজ শাসন বিলুপ্ত করার ইচ্ছা ক্রমেই প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে থাকে।

১৯৪২ সনের আন্দোলনঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আঘাতে ইংলণ্ড একান্ত বিব্রত হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষের নিরাপত্তাও ক্ষুণ্ণ হইবার আশংকা দেখা দেয়। ঐ সময় কংগ্রেস দাবী করে, ভারতের অধিবাসিগণকে স্বদেশ রক্ষার দায়িত্বের অংশ দেওয়া হউক। কিন্তু পরম সংকটের মধ্যেও ইংরেজ সরকার ঐ দাবী পূর্ণ করিতে অসম্মত হয়। তাহাদের এই অনমনীয় মনোভাবের ফলে এদেশে তীব্র অসন্তোষ আত্মপ্রকাশ করে। মহাত্মা গান্ধী একটি নূতন আন্দোলন পরিকল্পনা করেন। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য হইল ইংরেজগণকে এই দেশ ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য করা। মহাত্মা গান্ধীর পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার পূর্বেই এদেশের সকল বিশিষ্ট নেতাকে কারারুদ্ধ করা হয়। ইহাতেও কিন্তু আন্দোলন নিবারিত হয় নাই। নেতৃবিহীন হইয়াও জনসাধারণ মহাত্মা গান্ধীর পরিকল্পনাকে সার্থক

করিয়া তুলিতে অগ্রসর হয়। মহাত্মা গান্ধীকে কারারুদ্ধ করার ফলে ইংরেজ সরকারের ক্ষতি হয়। কারণ তাঁহার অনুপস্থিতির ফলে কোন কোন স্থানে আন্দোলন হিংসার পথ অনুসরণ করে। এই আন্দোলন ইতিহাসে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের আন্দোলন নামে পরিচিত। এই আন্দোলন এত তীব্র এবং এত ব্যাপক হয় যে অনেকে উহাকে বিপ্লব বলিতেও দ্বিধা করে না।

পূর্ববর্তী আন্দোলনের ন্যায় '৪২ সনের আন্দোলনও ইংরেজরা দমন করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু ঐ আন্দোলনে ভারতীয়েরা যে সংহতি ও আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়াছিল, তাহার কথা ইংরেজরাও ভুলিতে পার নাই। তাহাদের অনেকেই বুঝিতে পারে, সঙ্গীন ও বন্দুকের সাহায্যে ভারতবর্ষকে আর বেশী দিন নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হইবে না। তাহাদের এই অনুভূতিকে আরও গভীর ও শক্তিশালী করিয়া তোলে বাংলার বরপুত্র সুভাষচন্দ্র বসু।

সুভাষচন্দ্র বসু

সুভাষচন্দ্র ও আই. এন. এ ঃ ভারতবর্ষে থাকিয়া স্বাধীনতা আনয়ন করিতে পারা যাইবে না বুঝিয়া সুভাষচন্দ্র এদেশ হইতে আফগানিস্থানে চলিয়া যান। ঐ স্থান হইতে ইটালী ও জার্মানীতে গিয়া তিনি মুসোলিনী ও হিটলারের সহিত মিলিত হন। কিছুকাল পরে তিনি ডুবোজাহাজে চড়িয়া শত্রুপক্ষের চক্ষে ধুলি দিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় উপস্থিত হন। ঐ স্থানে ভারতীয়গণকে লইয়া তিনি একটি সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। ঐ সৈন্যবাহিনীর নাম

হয় ভারতীয় জাতীয় বাহিনী (Indian National Army—I. N. A.)। তারপর সৈন্যবাহিনী লইয়া তিনি বৃটিশ ভারতের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। তাঁহার সৈনিকদের লক্ষ্যস্থল দিল্লীর লালকেল্লা। সুভাষচন্দ্র দিল্লী পর্যন্ত আসিতে পারেন নাই। আসামের কোহিমা পর্যন্ত আসিয়া তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে হয়। ইহার পরে তাঁহার কি হইল তাহা আর জানা যায় না। অনেকে মনে করেন, তিনি আর বাঁচিয়া নাই, বহুদিন পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার দেহের ধ্বংস হইলেও তাঁহার প্রেরণা চিরকাল ভারতবাসীর নিকট অমর হইয়া থাকিবে।

সুভাষচন্দ্রের অভিযানের ফলে ভারতবর্ষকে যে বেশীদিন অধীন করিয়া রাখা যাইবে না, একথা বহু ইংরেজ আরও স্পষ্টতরভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। এই সময় শ্রমিকদল ইংলণ্ডে শাসনভার লাভ করে। নূতন মন্ত্রিসভা ভারতবর্ষে নেতাদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিবার জন্য এদেশে কয়েকজন মন্ত্রীকে প্রেরণ করেন। ইঁহাদের পরামর্শে শ্রমিক সরকার ভারতবর্ষের শাসন ভার ভারতবাসী-দের হাতে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হয়।

মহম্মদ আলি জিন্না

মুসলমানেরা কিন্তু হিন্দুদের সহিত অখণ্ড ভারতবর্ষের নাগরিক হইয়া থাকিতে অসম্মত হয়। তাহাদের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগের সভাপতি মহম্মদ আলি জিন্না দাবী করেন, যে সকল অঞ্চলে মুসলমানেরা সংখ্যাগুরু, সে সব অঞ্চল ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একটি পৃথক

রাষ্ট্র সৃষ্টি করিতে হইবে। বহু হিন্দু এই দাবীর বিরোধিতা করে। ফলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভয়াবহ দাঙ্গা আরম্ভ হয়; ঐ দাঙ্গায় অসংখ্য লোক নিহত হয় এবং অপরিমেয় সম্পদ বিনষ্ট হয়।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। এক ভাগের নাম হয় পাকিস্তান, আর এক ভাগের নাম থাকে ভারতবর্ষ। দুইটি রাষ্ট্রকেই স্বাধীনতার অধিকার দেওয়া হয়। এইরূপে ভারতবর্ষ ইংরেজদের অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করে।

স্বাধীন ভারতের প্রথম সমস্যা হয় উহার শাসনতন্ত্র কিরূপ হইবে তাহা স্থির করা। এই উদ্দেশ্যে একটি গণপরিষদের অধিবেশন হয়। গণপরিষদ শাসনতন্ত্র রচনা করে এবং উহা কার্যকরী না হওয়া পর্যন্ত আইনসভারও কাজ করে। শাসনতন্ত্রের রচনা শেষ হয় ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর এবং উহা কার্যকরী হয় ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী। ঐ শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতবর্ষ বৃটিশ রাষ্ট্রমণ্ডলীর মধ্যে থাকিয়াও সার্বভৌম সাধারণতন্ত্রের মর্যাদা লাভ করে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের প্রায় ২২ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে এই দেশের সরকার যে সকল কাজ করিয়াছে তাহা অশেষ কৃতিত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষ একশাসনের অধীনে তাহার একতা, সংহতি, শক্তি ও সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষে স্থিতিশীল শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ শাসন জনসাধারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং তাহাদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির পরিপোষক। ভারত সরকারের বৈদেশিক নীতি শান্তি এবং সহযোগিতার উপরে প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন সংস্কৃতির সহিত উহার সহাবস্থানের আদর্শ অনুসরণ করিয়া এদেশের অধিবাসিগণকে বিদেশে শ্রদ্ধার পাত্র করিয়া তুলিয়াছে। আজ বিশ্বের সভায় ভারতের আসন অতীব

গৌরবময়। ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অশেষ মর্যাদার অধিকারী হইয়াছে। ভারত সরকারের উদ্যমের ফলে দেশবাসীর বহুমুখী উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ভারতবাসীদের শিক্ষা গভীরতর এবং ব্যাপকতর হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বর্ধিত হইয়াছে। শিক্ষার পরিধি বিস্তৃত হইয়াছে এবং শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বহু কারিগরী ও প্রযুক্তিমূলক শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শিল্পেরও বিশেষ প্রসার হইয়াছে। বহু ভারী শিল্পায়তনের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এদেশে এখন জাহাজ এবং বাষ্পীয় ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির নির্মাণ সম্ভব হইতেছে। ভারী শিল্পের সহিত কুটির শিল্পেরও বিকাশ হইতেছে। পরিবহনের ব্যবস্থার উন্নতির ফলে শিল্পেরও প্রসারের সুযোগ হইয়াছে। বহু নদীর জল বাঁধের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত করিয়া এবং খালের সাহায্যে ঐ জলের বিতরণ সম্ভব করিয়া বহু উষর জমির উর্বরতা সাধিত হইয়াছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিলোপ হইয়াছে এবং কৃষকদের অধিকার বিস্তৃততর করা হইয়াছে। কৃষির উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং বিদেশ হইতে শস্য আমদানি করিবার প্রয়োজন কমিয়াছে। শিল্পের ও কৃষির ক্ষেত্রে সমবায় প্রথার উৎসাহ দেওয়া হইতেছে। ফলে দেশ অসংখ্য সমবায় প্রতিষ্ঠানে ভরিয়া গিয়াছে। এই সব উন্নতির ফলে ভারতবাসীদের জীবনের মান উন্নত হইয়াছে। দেশের প্রতিরক্ষার শক্তিও বর্ধিত করা হইয়াছে। শত্রুর সম্ভাবিত আক্রমণের প্রতিরোধ কল্পে দেশের অস্ত্রশক্তি স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হইতেছে এবং প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্রের নির্মাণও আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং ভারত সরকারের কার্যাবলীর কৃতিত্ব অশেষ। ঐ কার্যাবলীর ফলে ভারতবাসী অনৈক্য হইতে ঐক্যে, অশান্তি হইতে শান্তিতে, বিপদ

হইতে নিরাপত্তায় উন্নীত হইয়াছে। তাহাদের সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনযাত্রার পথ সুগম হইয়াছে।

গোষ্ঠী নিরপেক্ষতার নীতিঃ পৃথিবীর অধিকাংশ প্রধান রাষ্ট্রগুলি দুইটি পরস্পর বিরোধী গোষ্ঠীর অন্তর্গত। প্রথম গোষ্ঠীর নেতা হইল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। দ্বিতীয় গোষ্ঠীর নেতা হইল রাশিয়ার সোভিয়েট ইউনিয়ন। এই দুইটি গোষ্ঠীর মধ্যেকার সম্পর্ক এতদিন অতিশয় তিক্ত ছিল। উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনাও ছিল। ভারতবর্ষ কোন গোষ্ঠীর সহিতই যুক্ত হয় নাই। এই দেশ নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে। ভারতবর্ষ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের নিকট হইতে আর্থিক এবং কারিগরী সাহায্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই সাহায্য কোনও দিনই তাহার কর্মের স্বাধীনতা সংকুচিত করে নাই। সে প্রয়োজন হইলে উভয় গোষ্ঠীর নীতির সমালোচনা করিয়াছে এবং সর্বক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করিয়াছে। সে উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে সহযোগিতা প্রবর্তন করিতে যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছে। তাহার এই যত্নের ফলে আন্তর্জাতিক শান্তির পথ সুগম হইয়াছে এবং বিদেশে ভারতবাসীর সম্মান বর্ধিত হইয়াছে।

বিশ্ব সভ্যতায় ভারতের অবদানঃ ভারতবর্ষের একদিকে হিমালয় পর্বত আর তিনদিকে সমুদ্র। কিন্তু এই সব বাধা এই দেশকে পৃথিবীর অন্য সকল অংশ হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিতে পারে নাই। অতি প্রাচীনকাল হইতেই ইহার সহিত বাহিরের সংযোগ চলিয়া আসিয়াছে। এখন এই সংযোগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

ভারতের অধিবাসীরাও অতি প্রাচীনকাল হইতেই দূরদেশে যাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। মহেঞ্জোদারোর ও হরপ্পার অধিবাসীদের

সহিত পশ্চিম এশিয়ার অধিবাসীদের যোগাযোগ ছিল। এই যোগাযোগের অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বেও ভারতীয়েরা সিরিয়া, ব্যাবিলন মিশর প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করিতে যাইত।

ভারতবর্ষের উপকূলে প্রাচীনকালে বহু বন্দর ছিল। আমাদের সময় হইতে প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বেও এই সকল বন্দর হইতে বহু জাহাজ মণিমুক্তা, সুগন্ধি মসলা এবং সূক্ষ্ম মসলিন কাপড় লইয়া চীন সাম্রাজ্যে, ভারত মহাসাগরের দ্বীপমালায় এবং মিশরে যাইত। মিশর হইতে এইসব পণ্য ইউরোপে চালান করা হইত। স্থলপথেও ভারতের পণ্য ইউরোপে পাঠান হইত। আমাদের সময় হইতে সাড়ে সাতশত বৎসর পূর্বেও দক্ষিণ ভারতের প্রান্তে কায়ল নামে একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। এই বন্দর হইতে পণ্য বোঝাই করিয়া বহু জাহাজ পৃথিবীর বহু সুদূর অংশে যাতায়াত করিত।

ভারতীয়েরা বিদেশে শুধু বাণিজ্য করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। তাহারা অনেক জায়গায় গিয়া স্থায়িভাবে বসবাসও করিয়াছে। তাহাদের বসতির ফলে মধ্যএশিয়ায় বহু সুন্দর জনপদ গড়িয়া উঠে।

ভারতের দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পূর্বেও ভারতীয়েরা অতি প্রাচীনকালেই উপনিবেশ স্থাপন করে। প্রবাদ আছে, বিজয় সিংহ নামে এদেশের একজন অধিবাসী লঙ্কাদ্বীপ জয় করেন এবং ঐ স্থানে একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার নাম অনুসারেই নাকি লঙ্কার নাম সিংহল হইয়াছে।

মালয় উপদ্বীপ, ইন্দোচীন, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বালী, বোর্ণিয়ো এবং ভারত মহাসাগরের আরও অনেক দ্বীপে ভারতীয়েরা উপনিবেশ স্থাপন করে। এই সব উপনিবেশে বহু শক্তিশালী রাজ্যও গড়িয়া উঠে। ইহাদের অনেকের প্রভাব হাজার বছরেরও বেশী স্থায়ী হয়।

ভারতীয়েরা শুধু বাণিজ্য করিতে অথবা রাজ্য গড়িয়া তুলিতে বিদেশে যায় নাই। তাহাদের অনেকে গিয়াছে এদেশের সভ্যতা প্রচার করিতে। তাহাদের এই প্রচারের ফলে ভারতবর্ষের শিল্প, সাহিত্য, জ্ঞান ও ধর্ম এশিয়ার দূরতম অংশে ছড়াইয়া পড়ে।

এই সকল বিবরণ হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষ পৃথিবীর বহু দেশের উন্নতির সহায়তা করিয়াছে।

বর্তমান পৃথিবীতে ভারতবর্ষ পৃথিবীর সকল জাতির সহিতই মৈত্রী ও সহাবস্থানের নীতি অনুসরণ করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও সংস্কৃতির পথ সুগম করিয়া তুলিতেছে।

ভারতের বাহিরে মুক্তির আন্দোলন ঃ ভারতবাসীরা যখন স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রাম করিতেছিল, তখন এশিয়া ও আফ্রিকায় আরও কয়েকটি দেশে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিতেছিল। মধ্যপ্রাচ্যে (পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকার সন্নিহিত অঞ্চলে) ঐ আন্দোলন বিশেষ সাফল্যলাভ করে। আমরা প্রথমে মধ্যপ্রাচের অন্তর্গত পারস্যের কথা বলিতেছি।

বাহিরের দিক দিয়া দেখিলে, পারস্য ছিল স্বাধীন দেশ। কিন্তু ইউরোপীয়দের লোভের ফলে ঐ স্বাধীনতা অসার হইয়া পড়িয়াছিল। পারস্যে প্রচুর তৈল (Petrol) উৎপন্ন হইত। সামরিক, এমন কি অসামরিক কাজেও পেট্রোলের একান্ত প্রয়োজন। তাই পারস্যের তৈল সম্পদের উপরে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলির লোলুপদৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। উৎপাদন ও বিতরণ নিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা পারস্যে তাহাদের প্রভাব নিরঙ্কুশ করিবার অভিলাষ করে। পারস্যকে অনেকদিন এই প্রভাব সহ্য করিতে হয়, শেষে রেজাখা পহ্লবী নামে পারস্যের একজন নরপতি ঐ প্রভাব হইতে তাঁহার স্বদেশকে

অনেক পরিমাণে মুক্ত করেন। কিছুকাল পূর্বে পারস্য সরকার তৈল শিল্পকে পারস্যের জাতীয় সম্পত্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু এই ঘোষণা কতদূর কার্যকরী হইবে তাহা এখনও সঠিক বলা যায় না।

পারস্যের ন্যায় তুরস্কেও ইউরোপীয়েরা আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তৃত করিবার প্রয়াস করিয়াছিল। এক সময় তুরস্ক ছিল বিশাল সাম্রাজ্যের কেন্দ্র। কিন্তু এই সাম্রাজ্যের সীমা ক্রমেই কমিয়া আসিতে থাকে। ইহার কতকটা অংশ রাশিয়া জয় করে, আবার কতকটা অংশ স্বাধীন হইয়া যায়। তুরস্কের সুলতানের শাসন ছিল প্রগতি বিরোধী, অকর্মণ্য এবং অনাচারে পরিপূর্ণ।

কামাল পাশা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক জার্মানীর পক্ষ গ্রহণ করে। জার্মানীর পরাজয় হইলে তুরস্কের শত্রুরা উহার স্বাধীনতা পর্যন্ত বিপন্ন করে। কিন্তু কামাল পাশা নামক একজন তুর্কী সেনানায়ক তাহাদের এই প্রয়াস ব্যর্থ করেন। তিনি সুলতানের অযোগ্য শাসনেরও অবসান করিয়া তুরস্ককে একটি গণতন্ত্রে পরিণত করেন এবং ইউরোপীয় আদর্শে উহার রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন নূতন করিয়া গড়িয়া তোলেন। তিনি অনেক বৎসর ধরিয়া তুরস্ক সাধারণ-তন্ত্রের শাসন পরিচালনা করেন। তাঁহার সংস্কার ও সুশাসনের ফলে ঐ দেশ একটি প্রগতিশীল ও শক্তিশালী রাষ্ট্র হইয়া ওঠে।

এক সময় মিশর, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া ও আরবদেশ তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ইহাদের মধ্যে মিশর ঊনবিংশ শতকের

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দাদাভাই নৌরজী

গোপালকৃষ্ণ গোখলে

বালগঙ্গাধর তিলক

বিপিনচন্দ্র পাল

অরবিন্দ ঘোষ

লালা লাজপৎ রায়

শেষের দিকে ইংলণ্ডের অধীন হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে এই অধীনতার অনেকটা অবসান হয়। কিন্তু দেশের কোন কোন অংশ কিছুকাল পূর্বেও ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। সম্প্রতি ঐ নিয়ন্ত্রণের কার্যতঃ অবসান হইয়াছে।

প্যালেস্টাইন, সিরিয়া ও আরবদেশের অধিবাসীরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তুরস্কের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিতে উন্মুখ হইয়া উঠে। কিন্তু ঐ বন্ধন ছিন্ন হইলেও তাহাদের আশা পূর্ণ হয় না। ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্র বিভিন্ন নামের অন্তরালে তাহাদের উপর আপনাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। মাত্র অল্পকাল পূর্বে তাহারা স্বাধীনতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

এইবার আবার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা বলিতেছি। এই অঞ্চলে ইন্দোনেশিয়া ছিল হল্যাণ্ডের, ইন্দোচায়না ফ্রান্সের, মালয় উপদ্বীপ, ব্রহ্মদেশ এবং সিংহল ইংলণ্ডের অধীন; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান কিছুকালের জন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অধিকার করে। পরে তাহারা ঐ অঞ্চল ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হয়। জাপানীদের নিকট হইতে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র লাভ করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অধিবাসীরা ইউরোপীয় শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে সমর্থ হয়। তাহাদের এই সংগ্রাম অনেকটা সাফল্যও লাভ করিয়াছে।

হল্যাণ্ড ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। উহার দ্বীপগুলি সম্মিলিত হইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতা লাভ করে, তাহার কাছাকাছি সময় ব্রহ্মদেশ এবং সিংহলও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করিয়াছে। ইন্দোচীন এবং মালয় উপদ্বীপের অধিবাসিগণ ফরাস ও ইংরেজ প্রভুত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে।

মিশর, ইন্দোনেশিয়া, মালয় এবং ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশের স্বাধীনতা লাভে ভারতের সহায়তা

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা লাভেও সে যত্নের ত্রুটি করে নাই। যে সকল দেশের স্বাধীনতা লাভে তাহার ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ, তাহাদের মধ্যে প্রধান হইল মিশর, ইন্দোনেশিয়া, মালয়, ইন্দোচীন প্রভৃতি।

মিশর ঃ মিশর ছিল ইংরেজের অধীন রাষ্ট্র। স্বাধীনতা লাভ করিবার পরও ইহার সার্বভৌম অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সুয়েজ খালের উপর ইংরেজদের প্রভুত্ব অবসান করিতে মিশরকে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল। অবশেষে রাষ্ট্রপতি কর্ণেল নাসের ঐ খালের অধিকার রাষ্ট্রায়ত্ত করেন। তাঁহার এই কাজের ফলে মিশরকে ইংরেজ, ফরাসী ও ইস্রায়েলের সশস্ত্র অভিযানের সম্মুখীন হইতে হয়। আমাদের পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু মিশরের এই সংকটমুহূর্তে তাহার সহায়তা করেন। তাঁহার এই সহায়তা মিশরের ভাগ্য পরিবর্তনের পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ হয়। রাষ্ট্রসংঘের একটি সশস্ত্র বাহিনী মিশরের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য ঐ দেশে প্রবেশ করে এবং ইংরেজ, ফরাসী ও ইস্রায়েলী বা।হনী মিশর পরিত্যাগ করেন। সুয়েজ খালে ইংরেজদের প্রভুত্বের শেষ হয় এবং মিশরের স্বাধীনতা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ হয়।

ইন্দোনেশিয়া ঃ ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দোনেশিয়া হল্যাণ্ডের অধীনতা হইতে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এই ঘোষণার ফলে হল্যাণ্ড ইন্দোনেশিয়া আক্রমণ করে। এবং উহার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সুকর্ণ ও প্রধানমন্ত্রী হাতাকে গ্রেপ্তার করে। ইন্দোনেশিয়ার এই সংকটে

ভারত উদাসীন থাকে নাই। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু নূতন দিল্লীতে একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশের বহু প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেন। সম্মেলন ইন্দোনেশিয়ার প্রাত হল্যাণ্ডের আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করে। জহরলাল নেহেরু দৃঢ়তার সহিত ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতার সমর্থন করিতে থাকেন। তাঁহার এই দৃঢ় সমর্থনে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হয়।

মালয়ঃ মালয় ছিল ইংরেজদের অধীন। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে এই দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে মালয়, সিঙ্গাপুর, সারওয়াক এবং উত্তর বোর্ণিও লইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। জহরলাল নেহেরু স্বাধীনতা এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার একজন সুদৃঢ় সমর্থক ছিলেন। তাঁহার সমর্থন মালয়ের স্বাধীনতা লাভে এবং যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সহায় হয়।

ইন্দোচীনঃ ইন্দোচীনে ছিল ফরাসী প্রভুত্ব কিন্তু ইন্দোচীনের বিভিন্ন অঞ্চলে এই প্রভুত্বের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম আরম্ভ হয়। এই স্বাধীনতার সংগ্রামে ভারতবর্ষ ইন্দোচীনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে জহরলাল নেহেরু ইন্দো-চীনের স্বাধীনতা স্বীকার করিবার জন্য ফরাসী পার্লামেণ্টে আবেদন করেন। ঐ বৎসরই ইন্দোচীনে যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হয়। ঐ যুদ্ধ-বিরতির ব্যাপারে ভারতের সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের মধ্যে মতৈক্যের পথ প্রশস্ত হয়। ঐ যুদ্ধবিরতি কার্যকরী করিবার জন্য নিযুক্ত তিনটি কমি-শনেরই চেয়ারম্যান ছিলেন তিনজন ভারতীয় প্রতিনিধি। তাঁহাদের নিরপেক্ষ সহযোগিতা কমিশনের কাজ সহজ করিয়া তোলে।

ভারতবর্ষ, নেপাল, আফগানিস্থান, পারশ্য প্রভৃতি দেশও মৈত্রীর আদর্শ অনুসরণ করে। স্বাধীন ভারতের নীতির ফলেই নেপালের

স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ হয়। আফগানিস্থানের সহিত ভারতবর্ষ শান্তি ও সহযোগিতার পথ গ্রহণ করে। পারশ্যদেশ যখন তাহাদের তৈল সম্পদ জাতীয় কর্তৃত্বের অধীন করে তখন ভারতবর্ষ তাহার কাজ সমর্থন করে।

অতএব আমরা দেখিতেছি যে, ভারতবর্ষ এশিয়ার বহুদেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিয়াছে। যখনই কোন দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হইয়াছে, তখনই এই দেশ বিপন্ন রাষ্ট্রের আনুকূল্য করিতে অগ্রসর হইয়াছে। তাহার আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার নীতি সকল দেশেরই স্বাধীনতা অব্যাহত রাখিতে সাহায্য করিয়াছে।

চীন বিপ্লবঃ সাম্যবাদীরা ইন্দোচীন ও মালয় উপদ্বীপে তাহাদের প্রভাব এখনও ব্যাপক করিয়া তুলিতে পারে নাই। কিন্তু মহাচীনে তাহারা সাফল্য লাভ করিয়াছে। জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে তাহারা চিয়াং-কাই-শেকের সহিত সহযোগিতা করিতে দ্বিধা করে নাই। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয় হইলে চীনে আর তাহার আক্রমণের ভয় থাকে না। চিয়াং-কাই-শেক কিন্তু লোকপ্রিয় হইতে পারেন নাই। সুযোগ বুঝিয়া সাম্যবাদীরা ঐ সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ আরম্ভ করে। এই আক্রমণ সফল করিয়া তুলিবার মত তাহাদের অনেক নেতা ছিল। ইহাদের মধ্যে প্রধান হইলেন মাও-সে-তুং।

মাও-সে-তুং

মাও-সে-তুং-এর নেতৃত্বে চীনা সাম্যবাদীরা চিয়াং-কাই-শেকের হাত হইতে চীনকে মুক্ত করিয়া লয়। কেবলমাত্র ফরমোসা দ্বীপে তাঁহার অধিকার বজায় থাকে এবং এখনও আছে।

ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে চীনের অভিযান

চীন বহুশত বৎসর ধরিয়া ভারতের মিত্র রাষ্ট্র বলিয়া পরিচিত ছিল। উভয় দেশের সংস্কৃতির মধ্যেও যোগসূত্র ছিল। চীন ভারতবর্ষের নিকট হইতে বহু সহায়তা লাভ করিয়াছিল। চীনের প্রধানমন্ত্রী ভারতবর্ষে আসিয়া এদেশের সহিত মিত্রতার কথা বলেন। কিন্তু এইসব উপকার চীন মনে না রাখিয়া ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে আক্রমণসুলভ মনোভাবের পরিচয় দেয়। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে চীন ভারত সীমান্তের পঞ্চাশ হাজার মাইল পরিমিত ভূমি দাবী করে। পর বৎসর চীন লাডাকে আরও দুই হাজার মাইল দাবী করে। ১৯৫৭ হইতে চীনারা লাডাকের সীমান্ত লঙ্ঘন করিয়া আসিয়াছে। তাহারা ভারতবর্ষের পূর্ব সীমান্তে লংজুর বিরুদ্ধেও অভিযান পরিচালিত করে। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে তাহারা নেফা পর্যন্ত আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়। তাহারা ঐ বৎসরে অক্টোবর মাসে ভারতবর্ষের নেফা ও লাডাকের দিকে অসংখ্য সৈন্যের দ্বারা আক্রমণ আরম্ভ করে। লাডাকে তাহারা ট্যাঙ্ক পর্যন্ত ব্যবহার করিতে দ্বিধা করে নাই।

চীনের এই ব্যাপক অভিযান সম্ভব হয় ভারতের চিরাচরিত শান্তি-প্রিয়তার জন্য। ভারতবর্ষ চীনের তথাকথিত মিত্রতার নীতির প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছিল। চীন যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে আক্রমণে যত্নশীল হইবে এ কথা ভারতবর্ষ ভাবিতেও পারে নাই। স্বাধীনতালাভের পর এই দেশ তাহার অর্থনৈতিক উন্নতির সমস্যার সমাধানে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি

তদ্বীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের পর এশিয়া ও আফ্রিকা

ও সহযোগিতার নীতি অনুসরণে নিমগ্ন ছিল। তাহার এই নিমগ্নতার সুযোগে চীন তাহার অস্ত্রসজ্জা সম্পূর্ণ করিয়াছিল এবং ভারতবর্ষের সীমান্তবর্তী দুর্গম অঞ্চলগুলির সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিল। পরে সে অতর্কিতভাবে ভারতবর্ষের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া আক্রমণ আরম্ভ করে। কিন্তু চীনাদের আক্রমণের ফলে ভারতবর্ষের সর্বত্র দেশপ্রীতির প্লাবন আরম্ভ হয়। এই প্লাবনের ফলে চীনাদের অগ্রগতি প্রতিহত হয় এবং তাহারা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করিতে বাধ্য হয়।

কালপঞ্জী

খৃঃ ১৮৮৫	কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা
খৃঃ ১৯০৫	বঙ্গ-ভঙ্গ
খৃঃ ১৯১১	বঙ্গ-ভঙ্গ রদ
খৃঃ ১৯২০	অসহযোগ আন্দোলন
খৃঃ ১৯২১	রেজা খা পহ্লবীর ক্ষমতালাভ
খৃঃ ১৯২২	তুরস্কে সুলতানী শাসনের অবসান
খৃঃ ১৯৩০	আইনঅমান্য-আন্দোলন
খৃঃ ১৯৪২	ভারত-ছাড়আন্দোলন
খৃঃ ১৯৪৭ (১৫ই আগস্ট)	ভারত ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা
খৃঃ ১৯৪৮	ইংরেজসরকার কর্তৃক ব্রহ্মদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকৃত
খৃঃ ১৯৪৮	সিংহলের ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভ
খৃঃ ১৯৫০ (২৬শে জানুয়ারী)	স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক সাধারণ-তন্ত্ররূপে আবির্ভাব

অনুশীলনী

১। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সংক্ষেপে বর্ণনা কর এবং উহার তাৎপর্যের পরিচয় দাও।

২। 'সত্যাগ্রহ' কথাটির অর্থ কি? কোন্ স্থানে ইহার প্রথম পরীক্ষা হয়?

৩। ভারতীয় মুসলমানেরা কি কারণে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল?

৪। ১৯২০ এবং ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী যে সব আন্দোলন আরম্ভ করেন তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৫। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী যে সব আন্দোলনের পরিকল্পনা করেন সংক্ষেপে সেই সব আন্দোলন বর্ণনা কর।

৬। আই. এন. এ.-র অভিযান কতদূর সফল হইয়াছিল?

৭ কি অবস্থায় ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা হয়?

৮ কামাল পাশা তুরস্কের কি উপকার করেন?

৯। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রাম কতদূর হইয়াছিল?

১০। চীনে সাম্যবাদী বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

১১। স্বাধীন ভারতের কার্যাবলীর কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

১২। ভারতবর্ষের গোষ্ঠীনিরপেক্ষ নীতি সংক্ষেপে বিশ্লেষণ কর।

১৩। বিশ্বসভ্যতায় ভারতের দানের আলোচনা কর।

১৪। মিশর, ইন্দোনেশিয়া, মালয় ও ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশের স্বাধীনতা লাভে ভারত কিরূপ সহায়তা করিয়াছিল?

১৫। ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে চীনের অভিযান বর্ণনা কর

বাবর - (১৪৮২ - ১৫৩০ খ্রী:) - [illegible]